পথের ভিখারী যেই, সেও আশা করে
ভবিষ্য জীবনে সুখী হ'তে একবার ;
সংসার পুড়িয়া ছাই সরলার তরে,
তাহার সুখের দিন আসিবে না আর !
হা সরলা ! হা বালিকা ! দেখে ফাটে প্রাণ !
হা বিধি ! করুণাময় কার এ বিধান ?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
ময়মনসিংহ।

বাসি ফুল।

একদিন পড়িয়া ভূতলে।
বাসিফুল কেঁদে শুধু বলে
"বসিয়া কোমল বৃন্তকোলে
ভাসিতাম সোহাগ-হিল্লোলে,
ধীরে আসি মলয় পবন
করিত রে আদরে চুম্বন,
মধুকর গুণ গুণ স্বরে
কত গান শুনাইত মোরে।
এবে কেহ ফিরে নাহি চায়
বাসিফুল ব'লে চলে যায়।
ধন ছিল রূপ ছিল আগে,
চাহিত সকলে অনুরাগে।
এবে মোর ফুরায়েছে সব,
তাই কেহ করে না গৌরব !!

শ্রীমতী কিরণময়ী দেবী।

শোক-অশ্রু।

(কোনও বিধবা বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

১

চোখের সম্মুখে এসে ভাসে বারে বারে
কাহার ভাবনা-ক্লিষ্ট কাতর বদন ;
শ্রবণ-কুহরে এসে বাজে অবিরাম,
কাহার মরমস্পর্শী করুণ ক্রন্দন ?

২

সহসা খুলিয়া গেল স্মৃতির অর্গল,
অতীতের কথা পুনঃ মনে উঠে জেগে ;
অবশ হৃদয় পুনঃ জাগে গত শোকে—
অজস্র অশ্রুর ধারা বহে নব বেগে !

৩

হৃদয়ের তন্ত্রিচয় গিয়াছে ছিঁড়িয়া ;
(ছিন্ন তন্ত্রী যোড়া দে (ও) য়া ?—সেত বিড়ম্বনা !)
অতীত মধুর গীতি মনে জাগাইতে
বেসুরা গাহিছে শুধু ছিন্ন হৃদি বীণা !

৪

বিগত দিনের কথা কখনো ভুলিনি,
(যে দিন হইতে মোর ভগ্ন আশা খেলা)
তবে কেন পোড়া হৃদে স্মৃতি কুহকিনি !
খেল চাতুরীর খেলা—কেন হেন ছলা ?

৫

যতই যতন স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে,
ততই উজ্জ্বলতর হেরি সে প্রতিমা,
ততই নেশায় যেন হই আত্মহারা—
মোহঘোরে হেরি আরো কত মধুরিমা !

৬

আমাকে ত্যজিয়া যেতে যদ্যপি গো তোর
হৃদয়ের প্রান্তদেশে লাগিল না ব্যথা,
তবে কেন তোর তরে—নিঠুরা পাষাণি—
বকে মরি বলে আমি এত শত কথা ?

৭

কিন্তু যবে বাতায়নে দাঁড়াইয়া হেরি,
পশ্চিমে রক্তিম ভানু প্রায় অস্তমিত ;
বিষাদে অভুক্ত পাখী ধায় নীড় পানে,
অবসাদে ফুলদল হয় বৃন্তচ্যুত,—

৮

তখন মনের বাঁধ হয় গো শিথিল,
তখন মনেতে বহে ঝটিকা-উচ্ছ্বাস,
ভগ্ন, জীর্ণ ক্লান্ত হিয়া, আরো ভগ্ন করি—
ঝরে কয় বিন্দু অশ্রু—উঠে দীর্ঘশ্বাস !!

শ্রীশৈলজা সুন্দরী দেবী।

“সেই দেশ”।

কেন আজ মনে পড়ে কথা সে দেশের ?
রোগ, শোক নাই যথা,
পরাণে নাইকো ব্যথা,
যে দেশে গাহে না কেউ গান বিষাদের।
যে দেশে বসন্ত বায়,
সুরভি মাখিয়া গায়
বয়ে যায় দিবানিশি নাহিক বিরাম।
না জানি সে দেশে গেলে কতই আরাম।

ভাবি মনে একাকিনী বিরলে বসিয়া,
দুঃখে তাপে ম্রিয়মাণ,
অবসন্ন যেই প্রাণ,
তৃষিত যে তুচ্ছ হৃদি সে দেশ লাগিয়া,
সেথা গেলে পাবে শান্তি,
ঘুচিবে সংসার-শ্রান্তি,
পাইবে অনন্ত সুখ অমরে সেবিয়া,
গাইবে স্বরগ গীতি—প্রাণ মোহনিয়া।

সে দেশ কেমনতর বলিব কি করে ?
সেথা দেববালাগণ,
করে সদা বিচরণ,
কোকিল হরষে বসি গায় কুহুস্বরে।
সেথা কঠোরতা নাই,
নীরব, নিস্তব্ধ ঠাঁই,
যেথায় দুঃখেতে নাহি তপ্ত অশ্রু ঝরে।
সে দেশে বসন্ত রাণী সদাই বিহরে।
তুচ্ছ প্রাণ যেতে চায় যে দেশের পানে ;
তাপিত হৃদয় মোর,
ভেঙ্গে চুরে মোহ ঘোর,
ধায় সে দেশের লাগি, পরাণের টানে।
শত বাধা এড়াইয়া,
ক্ষুদ্র হৃদি বিকাইয়া,
চলে আজ দেবদেশে আশাপূর্ণ প্রাণে,
যথায় অমরবৃন্দ গায় একতানে।
কবে হবে শুভদিন জীবনে আমার,
ছাড়িব মরতধাম,
গাব সদা বিভুনাম,
দূরে যাবে ভয়, দুঃখ, নয়ন-আসার।
দেবতার আশীর্ব্বাদে,
থাকিব গো নির্ব্বিবাদে,
করিব সার্থক জন্ম তুচ্ছ রমণীর
হ'ক হেন শুভদিন বরে বিধাতার।

কুমারী সুকুমারী দাস।

No. 398. March, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৮ সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩০৪—মার্চ্চ, ১৮৯৮। ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির রাজধানী ত্যাগ—আগামী মাসের শেষে লর্ড এলগিন সদলে সিমলা শৈলাবাসে গমন করিবেন। এই বৎসর ইহাঁর রাজত্বের শেষ বৎসর। আমরা প্রার্থনা করি, রাজপ্রতিনিধি পর্ব্বতের শীতল বায়ুতে বসিয়া ভারতের স্থায়ী কোনও মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইবেন।

অকালে শীত—কবিবর মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী চণ্ডীতে গাইয়াছেন "ফাল্‌গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা," এবার তাহাই ঘটিয়াছে। বসন্তের হাওয়া বহিয়া ও রৌদ্র প্রখর হইয়া ফাল্‌গুনে হঠাৎ দ্বিগুণ শীত পড়িয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝটিকা ও অতিরিক্ত বরফপাত ইহার কারণ।

হত্যাকারীর আপিল—দামোদর হরি-চোপকার প্লেগ কমিসনরের হত্যাকারী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, এখন তাহার আপীল শুনা হইতেছে। সে আপনার মুখে আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এখন বলে পুলিসের ভয়ে মিথ্যা এজাহার দিয়াছে, সে হত্যাকারী নয়।

মৃত্যু—(১) গত ৭ই ফাল্‌গুন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জগবন্ধু বসুর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নব-প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারি কলেজের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইহাঁর বিয়োগে উক্ত কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। (২) ১৮ই ফাল্‌গুন স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের গুণবতী পত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। (৩) কুমারী ফ্লোরেন্স ইবা মর্গান বিলাত হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পুনা প্লেগ হাঁসপাতালে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন, হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

পারিতোষিক দান—(১) গত ১৫ই ফাল্গুন বেথুন কলেজের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ লেডী এলগিন দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে চিফ জষ্টিস ম্যাক্লিন সাহেব কলেজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষের একখানি ছবি বক্তৃতা সহকারে সাধারণ সমক্ষে মুক্তাবরণ করেন। (২) ১৬ই ফাল্গুন চিফ জষ্টিস পত্নী লেডী ম্যাক্লিন গড়ের মাঠে স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে ব্যায়াম পরীক্ষার পুরস্কার দান করেন।

মহারাণীর ভ্রমণ—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইউরোপের দক্ষিণাংশ ভ্রমণে আগামী গ্রীষ্মকাল অতিবাহন করিবেন।

সন্ধি—আবিসিনিয়ার রাজা মারিলকের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট হারিংটন ব্রিটিষ দূত স্বরূপ ঐ রাজ্যে থাকিবেন।

প্লেগ—বোম্বাইয়ের মহামারী আবার বাড়িয়া উঠিতেছে। পঞ্জাবেও দিন দিন ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

গ্লাডষ্টোনের সংবাদ—ইনি ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। ইঁহার আশ্চর্য্য লিপিদক্ষতায় সকলে চমৎকৃত। ইনি এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিবর্ষে অসংখ্য সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ৪।৫ হাজার চিঠি পত্র লেখেন। এ পর্য্যন্ত ২৯৯ খানি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। জগদীশ এরূপ মহাত্মাকে আরও দীর্ঘায়ু করুন।

গরিব লোকদের জন্য রাজপ্রাসাদ—গ্লাসগো নগরে লর্ড রোজবরী এই গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গরিবদিগকে ভাল ঘরে রাখিবার, ভাল খাদ্য খাওয়াইবার, রাজভোগ্য নানা উৎকৃষ্ট সুখে সুখী করিবার জন্য ইংলণ্ডের অনেক নর নারী ব্যস্ত। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" ইঁহারা এই বাক্যের সার্থকতা করিতেছেন।

প্রাচীন ভ্রম।

অনেকে কথায় কথায় বলিয়া থাকেন,—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যিনি যেরূপ ভাবেন, তাঁহার সিদ্ধি সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলেন:—কাচ পোকায় তেলা পোকা (আর্শুলা) ধরে। তেলা পোকা প্রাণের ভয়ে কাচ পোকাকে নিরন্তর ভাবিতে থাকে। ঐ ভাবনা নিবন্ধন কিছু দিন পরে তেলা পোকা কাচ পোকা হইয়া যায়। পৌরাণিক দৃষ্টান্ত—ভরতের হরিণ-যোনি-প্রাপ্তি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

যাহা ভাবিতে ভাবিতে জীব দেহ-ত্যাগ করে, দেহান্তে তৎপ্রাপ্তি হয়। ইহা শাস্ত্রের কথা। ইহা পরীক্ষা করিবার উপায় না থাকিলেও হিন্দুগণকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, কেননা শাস্ত্রে বিশ্বাসই হিন্দুত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া, "যাদৃশী ভাবনা যস্য—" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় শ্লোকের পর যিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? ঐ শ্লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে তেলা-পোকা কাচপোকার ইতিহাস অনেকেই বর্ণন করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ঐ ইতিহাস বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন যখন তখন অনেক অভিজ্ঞ বক্তার মুখেও ঐ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কথাটীর মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ভ্রম আছে।

প্রাণিমাত্রেই ডিম্ব, বা শাবক প্রসব করে; কিন্তু কোন কোন প্রাণীর ডিম্বাদি পালন করিবার শক্তি নাই। অনেকেই জানেন, কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে এবং কাকের ডিম্বগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। কাক আপনার ডিম মনে করিয়া কোকিলের ডিম পালন করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, কাচপোকার ডিম্ব রক্ষা করণোপযোগী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার ও ডিম পালিবার শক্তি নাই। কাচপোকার ডিম্ব প্রসবের সময় হইলে সে একটী তৈলপায়িকা ধরে এবং তাহার উদর ভেদ করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করে। ডিম্ব প্রসব এবং তৈলপায়িকার উদরমধ্যে ঐ ডিম্বের আধান, এই দ্বিবিধ ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে, কাচ পোকা তৈলপায়িকাকে পরিত্যাগ করে। এই সময়ে তৈলপায়িকার একটু যন্ত্রণা হয় বটে, কিন্তু সে প্রাণে মরে না—কাতর ভাবেই ইতস্তত: বিচরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে উদরস্থ ডিম্ব সকল স্ফুটিত হইয়া কাচপোকার শাবক-রূপে পরিণত হয়, এবং তৈলপায়িকার গর্ভস্থ মাংসাদি ভোজন করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তৈলপায়িকা যাতনায় ছট্ ফট্ করিয়া ২।১ দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। তখন কাচ-পোকার শাবকগণও তন্মধ্য হইতে বহির্গত হয়।

কোন কোন জাতীয় কাচপোকা, ডিম্ব প্রসবের পর তৈলপায়িকাকে পরিত্যাগ করে না, তাহাকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া, বা আর্দ্র মৃত্তিকাবরণে বদ্ধ করিয়া রাখে। তৈলপায়িকার উদর হইতে কাচপোকার সৃষ্টিপ্রকরণটী যেরূপ, তদ্দর্শনে কাচপোকাধৃত তৈল-পায়িকা ভাবিয়া ভাবিয়া কাচপোকা হইয়া যায়, স্থূলদর্শী জনগণের এরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে।

এক পদার্থ অন্য পদার্থ সহ মিলিত হইয়া স্ব স্ব গুণ, বা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণান্তর বা ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম সম্বন্ধ বা রাসায়নিক ক্রিয়া। এই সম্বন্ধের বা রাসায়নিক ক্রিয়ার, উদাহরণ

প্রদর্শনকালে অনেকেই চূর্ণ হরিদ্রার কথা উত্থাপন করেন। চূর্ণ শুভ্র ও হরিদ্রা পীত; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে,—অতএব ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া। অনেক গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ উহা রাসায়নিক দৃষ্টান্ত নহে;—উহা পরমাণুগণের বিভিন্নপ্রকার নিবেশ মাত্র। রাসায়নিক ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ এই যে, পদার্থগণের মিলনকালে উত্তাপের সমাগম বা অপগম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চূর্ণ হরিদ্রার মিলনকালে উহার অন্যতর কিছুই হয় না।*

এইরূপ কত বিষয়ে কত ভ্রম কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমাদের লক্ষ্য নাই। বোধ হয়, সকলের অভিনিবেশ থাকিলে মধ্যে মধ্যে এক একটী প্রাচীন ভ্রম আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে এবং তাহার নিরাকরণও হইতে পারে।

প্রকৃত স্ত্রী।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩২২ পৃষ্ঠার পর)

পতির প্রতি রমণীর যাহা কর্ত্তব্য গত সংখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত স্ত্রীর আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, এক্ষণে তাহাই বলিব।

পতি যেমন রমণীর পরমাত্মীয়, পতির আত্মীয়গণও তদ্রূপ রমণীর আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত; সুতরাং পতির পিতা মাতাকে স্বীয় পিতা মাতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা রমণীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলেই সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। কৌশল্যা সীতার ন্যায় আদর্শ শাশুড়ী বধূরও মনোমালিন্য বশতঃ অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছারখার হইতে দেখা যাইতেছে। এ স্থলে একপক্ষ বিচারক শাশুড়ীদিগের ও আর একপক্ষ বধূদিগের স্কন্ধে দোষভার ন্যস্ত করেন। এমতে প্রকৃত দোষী কে, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমরা নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া একটী প্রবাদ বচন দ্বারাই ইহার আলোচনা করিব। আমাদের দেশে যে সকল প্রবাদ বচনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক নহে।

"বৌ ভাঙলেন সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা॥"

অর্থাৎ বধূর ক্ষুদ্র দোষটুকুও প্রকাণ্ডাকার ধারণ করিয়া পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে এবং গিন্নির প্রকাণ্ড দোষটুকু ঘরের বাহিরও হয় না। এই প্রবাদ বচনটিতেই শাশুড়ীর স্বার্থপরতার ছবি উজ্জলরূপে প্রতিভাত।

---

* চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রণে যে পাটলবর্ণ হয়, ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া কি না, এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। বা,বো,স।

হিন্দু সমাজে রমণীগণ বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ স্থলেই তখন বালিকাদিগের বয়স চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে না। তখন তাহারা কর্ত্তব্যের কি বুঝে? জীবনের শিক্ষা শেষ না হইতেই তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করে, এমতে শ্বশুরালয়ে সংশিক্ষা লাভ না করিলে আর তাহাদের শিক্ষার স্থান কোথা? কিন্তু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, এই সময় হইতে শাশুড়ীগণ বধূদিগের কার্য্যকলাপ লইয়া খুঁটি নাটী আরম্ভ করিয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যভাবে একটী বধূর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া অন্যের হৃদয়ে ঈর্ষার দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া সোণার সংসার ভস্মীভূত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। অধিকাংশ স্থলে নাবিকের দোষে যেমন তরণী জলমগ্ন হইয়া আরোহীদিগকে বিপন্ন করে, গৃহিণীর দোষে তদ্রূপ সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া তৎসহযোগিগণ সেই অনলে ভস্মীভূত হয়। প্রবাদ-বচনেও আছে—

"গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট"

অতএব গৃহিণীর উদারচিত্ত হইয়া সকলকে সমান স্নেহ যত্ন প্রদান করাই কর্ত্তব্য। মৃদু ও মধুর বাক্যে বধূদিগকে উপদেশ প্রদান করা শাশুড়ীদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বনের পাখী ধরিয়া আনিলে আগে তাহাকে আদর যত্ন সহ লালন পালন করিতে হয়, পরে সে পোষ মানিয়া থাকে। একটী অপরিচিতা অবোধ অবগুণ্ঠ বালিকাকে গৃহে লইয়া আসিয়া, সমুচিত আদর যত্ন না করিলে সে বশীভূত হইবে কেন? এ সম্বন্ধে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভূদেব বাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠে বেশ সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়।

অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, প্রাচীনকালে বিশেষরূপে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। প্রাচীনা রমণীগণ কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমর-প্রাঙ্গণে, কি সংসার-ধর্ম্মে, সকল স্থলেই আবশ্যকমত নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও রমণীহৃদয়ের স্বর্গীয় ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা খোদিত রহিয়াছে। মধ্যে কিছুকাল স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, স্ত্রীজাতি মনুষ্যজাতি মধ্যে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত জীবন গঠিত হয় না, অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাই সমাজে মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমশিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। মধ্য সময়ের লোক ইহা বুঝিতেন না, সুতরাং ঐ সময় হইতে বধূদিগের প্রতি শাশুড়ীদিগের অযথা অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এখন সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সংবাদ পাওয়া যায়। হা দুর্দ্দৈব! কৌশল্যা, কুন্তী প্রভৃতি দেবীগণ, তোমরা এখন কোথা!!

"গতস্য শোচনা নাস্তি" সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখনও স্ত্রীজাতি শিক্ষা লাভ করিলে সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা তিরোহিত হইয়া সংসারে শান্তির আলোক দেখা যাইতে পারে।

রমণী জননী জাতি, সুতরাং উদার-চিত্তে জগতে প্রেমার্পণ করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণই আত্মপর বাছাবাছি করিয়া থাকেন, উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশ্বে আপনাকে মিশাইয়া সর্ব্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়েন। যিনি বিশ্বসেবারূপ মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়খানিই প্রকৃত স্বর্গ। এইরূপ স্বর্গ লাভের চেষ্টা করা রমণীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ক্ষমাশীলতা স্ত্রীজাতির একটী প্রধান ভূষণ। যিনি ক্ষমাশীল, নশ্বর জগতের জীবের কথা কি, তিনি দেবতাদিগেরও আদরণীয়। যথা—

অতিবাদং ন প্রবদেন্ন বাদয়েৎ,
যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
হন্তুশ্চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ
তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়।"

উদ্যোগ ৩৫।১২৭০।

শাস্ত্র প্রকৃত স্ত্রীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং করোতি হি।
বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।

অনুশাসন। ১৪৬।৬৭৮৫।

অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকিয়া দেববৎ স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া সুখ-দর্শনা হয়েন, সেই প্রকৃত স্ত্রী। আবার,—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

আদিপর্ব্ব।

অর্থাৎ তিনিই ভার্য্যা, যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষ ও পুত্রবতী এবং যাঁহার হৃদয় বাক্য ও কার্য্য সকল পবিত্র ও যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

রমণীমাত্রেরই প্রকৃত স্ত্রী হইবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃত চেষ্টার পুরস্কার শ্রীভগবান্ অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যথোচিত-রূপে পালন করিতে পারি না, সেই জন্যই আমাদের এত অধঃপতন ঘটিতেছে।

"যাতাধোধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ"।

অর্থ—কূপখননকারী যেরূপ ক্রমে নিম্নগতি এবং প্রাচীরগাথক ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, মানব সেইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে উচ্চতা ও নীচতা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিজ উচ্চতা লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমরাও সফলকাম হইতে পারিব।

নশ্বর জীবন কয় দিনের জন্য? সৎ-কীর্ত্তিই প্রকৃত জীবন। ভগিনীগণ! আইস আমরা সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত জীবন লাভের চেষ্টা করি। ভারত আবার সীতা সাবিত্রীর পবিত্র ছবি লইয়া ধন্য হউক্।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

রত্নমালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেফালি একদিন ফুল তুলিতে তুলিতে গুণ গুণ করিয়া গাইতে গাইতে কুটীরের নিকটবর্ত্তী একটী গিরিবর্ত্ম ধরিয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিল না। সেই সময় তাহার উপর দিয়া একটী বসন্তের কাল কোকিল দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার করিয়া চলিয়া গেল। সেফালি চমকিত ভাবে আকাশের দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিপাশে বৃহৎ শ্বাপদ-সমাকুল ঘোর অরণ্যানী। সেফালি মহা ব্যস্ত হইয়া কুটীরে ফিরিতে চাহিল, কিন্তু পথ নাই। সে অনেকবার পথের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে পথ যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার সেই নির্জ্জন কুটীরের শ্যাম সৌন্দর্য্যের কথা মনে হইল। ধীরে ধীরে পিতার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি মনে হইল, তেজকুমারের কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একখানি মুখ তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হইল। বালিকার কুসুম-কোরকোপম নয়নে অশ্রুজল বহিয়া গণ্ড ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বালিকা তাহাতেও অধীর হইল না, হৃদয়ের বল হারাইল না, কারণ সে জানিত ভগবান্ বিপদভঞ্জন। সম্মুখেই একখানি শ্বেত শিলাখণ্ড, বালিকা তাহার উপর বসিয়া ভগবানের ধ্যানে মনোনিবেশ করিল। সেই ধ্যানমগ্না বালিকার শিথিল অঞ্চল বাতাসে উড়িতেছিল, মুদ্রিত নেত্রে প্রেমাশ্রু পড়িতেছিল, যুক্ত কর-পল্লব ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। সেই অরণ্যে সনাতন ধর্ম্ম-দ্বেষী কয়েকজন দৈত্যপ্রকৃতি মানব বাস করিত; অচিরাৎ সেই ধ্যানমগ্না বালিকা তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহারা গভীর গর্জ্জন করিয়া সেফালির কেশাকর্ষণ করিতে করিতে শূন্যে উঠাইয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য লইয়া গেল। সেফালি কি তদবস্থায় অচেতন? না না, সেফালি প্রাণের কাতরতায় মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়া কহিল "তাহাই হউক, যাঁহার ইচ্ছায় এই অনন্ত বিশ্বজগৎ শাসিত হইতেছে আজ তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" "ভগবান সহায় হও, ভগবান সহায় হও"—অসুরদিগের বিকট চিৎকার ধ্বনির মধ্যেও সেফালির কর্ণে এই গম্ভীর মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল। "ভগবান্ সহায় হও! ভগবান্ সহায় হও" কি মধুর কণ্ঠ, কি পবিত্র স্বর! মুহূর্ত্তমধ্যে অসুরদল লণ্ড ভণ্ড হইয়া কে কোথায় পলাইয়া গেল। সেফালি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে

দীর্ঘাকৃতি এক মনুষ্যমূর্ত্তি, তাঁহার বাম হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি। সেফালি অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে চিনিল, তিনি সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তখন উৎপীড়িত ধূল্যবলুণ্ঠিত কল্পলতিকা তুল্য সেফালিকে অতি যত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া কুটীরে রাখিয়া আসিলেন। এই স্পর্শে সেফালির মনোমধ্যে নির্বাত নিকম্প প্রদীপের ন্যায় একরূপ অনল জ্বলিল, সেফালি সন্ন্যাসীর হস্ত ধরিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল "দেবতা, আবার যেন দেখা পাই।"

একদিন সন্ধ্যাকালে তেজকুমার ও সেফালি বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে মালতী বৃক্ষের উপরে সোণার চাঁদ হাসিতেছিল, শিশিরসিক্ত নৈশসমীর গাছ পাতা দুলাইয়া দুলাইয়া যেন ঘুম পাড়াইতেছিল, চারি পাশে কূলে কূলে শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউ বহিতেছিল। তেজকুমার কহিল "সেফালি, তুই মুকুলকে ভুলিয়া যা।" অনাহূত চক্ষের জলে সেফালির মুখখানি প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি বালিকা তৎক্ষণাৎ অশ্রুজল মুছিয়া হাসিয়া উঠিল।

তেজ। ভুলবি না? এমনি করিয়া অনর্থক কষ্ট পাবি?

সেফালি। আচ্ছা, যদি কোন দিন কষ্ট বোধ করি, তবে তাহাকে ভুলিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব।

তেজ। তোর চির কালই ঐ এক কথা।

সেফালি হাসিয়া কহিল "তবে কি দুই কথা বলিতে বল? এক মুখে দুই কথা বলা কি ভাল?"

তেজকুমার কিছুতেই সেফালিকে দুঃখের পথ হইতে সরাইতে না পারিয়া কাতর হইয়া কহিল "সেফালি, যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিল, তুই তাহাকে ভাল বাসিবি?"

এবার সেফালির মুখ গম্ভীর হইল। সেফালি গম্ভীরস্বরে কহিল "তিনি কাহাকেও কষ্ট দেন নাই।"

তেজ। তাহার ধূর্ত্তামি তুই কি বুঝিবি? এই ভাষণ দোষ তাহার উপর আর্পিত হইবে বলিয়াই সে নিরুদ্দেশ হইয়া আছে। তুই জানিস্ সে তোকে ভাল বাসে না?

গম্ভীর স্বরে সেফালি কহিল "তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া নিশ্চেষ্ট রহেন নাই। তাঁহার ভালবাসা সেফালির ভালবাসা হইতেও উচ্চ, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া তেজকুমার কহিল "সেফালি, তুই কি তাহাকে ইতিমধ্যে দেখিয়াছিলি?"

কম্পিতকণ্ঠে সেফালি কহিল, "হাঁ আমার এমনি বিশ্বাস"। তেজকুমারের পিতা হইলে কহিতেন এত প্রেম নয়, এ হরিবোলের রোষবহ্নি আমাকে বিদগ্ধ করিবার জন্য এ সুন্দর বনপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। তেজকুমার তাহা কহিল না। সে নিজে প্রেমিক, প্রেমের

অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাহার অবিদিত ছিল না, অতএব সে ছোট রকমের একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সেফালি তোকে আর কত বুঝাইব? যদি মুকুলকে ভুলিতে না পারিস, তবে চিরকালের মত জীবনের সুখের আশা পরিত্যাগ কর্। বোধ হয় পিতার জলন্ত প্রতিজ্ঞার কথা চিরকালই তোর মনে জ্বলিবে।

সেফালি সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, তাহার অনাহূত চোখের জলই সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছিল।

সহসা পিনাকীর রুদ্ধ কণ্ঠের একটী বিকট চিৎকার তাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা দ্রুতপদবিক্ষেপে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সংন্যাস রোগে পিতার মুমূর্ষু অবস্থা।

নিরতিশয় ব্যাকুলতার সহিত ভ্রাতা-ভগ্নী পিতার শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল, এবং চিকিৎসায় কিছু হইল না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ঘন ঘন বজ্রপাতের সঙ্গে ঘোর শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সমস্ত অরণ্য সহ ক্ষুদ্র কুটীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। বিপদের উপর বিপৎপাত! তেজকুমার ভয়বিহ্বলচিত্তে ব্যাকুল হইয়া ডাকিল—ভগবান্! ভগবান্!! "আমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য আসিতেছি; ভয় নাই, ভয় নাই!" তেজকুমার দেখিল—সেফালি দেখিল, সেই বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়া এইরূপ বজ্রগম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী তাহাদের কুটীরে উপস্থিত হইল। সে যাত্রা তেজকুমারের পিতা আর রক্ষা পাইলেন না, তেজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেফালিকে কহিলেন "সেফালি! আজ মুমূর্ষু পিতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর্ কখনও হরি-বোলের পুত্রকে বিবাহ করিবি না।" পিতার এই কঠোর আদেশ সেফালির ক্ষুদ্র হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বাজিল। সেফালি কম্পিত অধর খুলিতে না খুলিতেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই দুঃখের সময়ে সন্ন্যাসী এই বিপন্ন পরিবারের যে মহোপকার করিয়াছিল, তাহা তাহারা সমস্ত জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

ইলিয়ড।

(গত প্রকাশিতের পর)

এতেক বলিয়া যবে নীরবিলা বীর,
এইরূপে নরপতি উত্তরিলা তারে—
"ভেবেছ কি মনে তুমি, শান্ত মনে আমি
ত্যজিব ও বন্দিনীরে মম, আর তুমি
রবে অধিকার করি সুখে নারী তব?
হও না হে বলী, সমরে অমর সম,

বীরত্বে প্রধান ; কিন্তু ভাবিও না কভু—
সৈনিকের অধিকার অবাধে দুর্বৃত্ত
তুমি করিবে হরণ। তব প্রার্থনায়
অর্পিব যাজকে আমি ক্রুসিসা বালায়ে,
কিন্তু অগ্রে উপযুক্ত মূল্য তার সবে
করহ প্রদান, হেন মূল্য নরপতি
পারেন যাচিতে যাহা, আর যোগ্য তাঁর।
নতুবা এ মম রাজ-অধিকার বলে,
এই হস্ত মোর অন্ত কোন বন্দিনীরে
করিবে গ্রহণ। অতুল প্রতাপশালী
বীরেন্দ্র এজাক্স, ত্যজিতে হইবে তাঁরে
বন্দিনীরে তাঁর, কিম্বা ইউলিসিসের,
কিম্বা বীর তোমার সে হইবে আমার।
যার ইথে হবে ক্ষতি-বোধ কিম্বা ক্লেশ,
পারে সে করিতে অভিযোগ, কিম্বা পারে
হইতে কুপিত, কিন্তু সেই রোষ তার
তুচ্ছ বলি গণি। থাক্ এ সকল কথা,
যথাকালে ইহা মোরা করিব সাধন,
সাধিতে হইবে শীঘ্র মোদের এখন
দেবকার্য্য শুভ—ক্রাইসিস উপকূলে
উল্লাসি জলধি, দ্রুত সঞ্চালি ক্ষেপণি
মনোনীত কয়জন নাবিক সহিত,
প্রেরিত হইবে চারু-তরণী মোদের,
সহ যত বলি আর নৈবেদ্য-সম্ভার।
করুক্ সে তরীপরে ক্রুসিসা সুন্দরী
বরা আরোহণ, আর তাহার সহিত
প্রতিনিধি নৃপ কেহ করুন গমন।
ক্রিটাসের অধিপতি, কিম্বা উলিসিস
কিম্বা বীরেন্দ্র এজাক্স, মোদের এ ইচ্ছা
করুন্ পূরণ। কিম্বা যদি রাজ-ইচ্ছা
হয় অর্পিবারে আকিলিস্ বীরবরে
এই কার্য্য-ভার, প্রচণ্ড কুপিতচিত্ত,
সে বীর প্রধান, রাজাদেশ শিরে ধরি
স্বয়ং এ কার্য্য সাধি করুন্ প্রসন্ন
দেব অ্যাপোলোরে, আর নিবারুন্ ত্বরা
কালমৃত্যুরূপী এই ভীষণ মড়ক।"

কঠোর ভ্রূকুটি করি গর্জিয়া গম্ভীরে
এইরূপে পিলিডাস* করিলা উত্তর—
"হে যথেচ্ছাচারী ! গর্ব্ব ঔদ্ধত্যের বলে
বলী তুমি শুধু, আর, নীচ স্বার্থ-দাস,
চাতুরী ও ছলনায় নিরত নিয়ত,
নহ যোগ্য তুমি উচ্চ রাজ-হৃদয়ের।
উদারহৃদয় কোন্ গ্রীক বীর, আজ্ঞা
তব নৃপাধম ! করিবে পালন আর
গুপ্ত রণব্যূহ হায় ! করিবে রচিত,
কিম্বা তরবারি তীক্ষ উঠাইবে আর
হানিতে অরিরে ? কি কারণে বল আজি
প্রবৃত্ত দুর্বৃত্ত মোরা করিতে সমর
হেথা দেশে হেথা ? দূরদেশবাসী এই
ট্রয়বাসিগণ কভু মোর কোন ক্ষতি
করেনি সাধন, কিম্বা দূর থিয়টিসে
বিপুল বাহিনী সহ কভু শত্রুভাবে
করেনি গমন। চরিত নির্ভয়ে তার
উপত্যকামাঝে, সমরকুশলী মম
অশ্বগণ যত, রক্ষিতেছে নিরাপদে
যে দেশ সতত গভীর কল্লোলময়
অকূল জলধি আর শৈলের প্রাচীর ;
যাহার উর্ব্বরা ভূমি আছয়ে পূর্ণিত
ফল শস্যে আর মহাযোদ্ধ বীরদলে।
হেথা মোরা আসি নাই সাজি দলবলে
শত্রুতা সাধিতে, সর্ব্ব গ্রীকগণ পরে

*একিলিস।

ট্রোজানগণের কোন অন্যায়াচরণে,
কিন্তু হে একের পরে, আচরিত ঘোর
অন্যায়ের যথোচিত প্রতিবিধানিতে,
স্ব-ইচ্ছায় হেথা মোরা আসিয়াছি সবে।
হে কুতম! তব আর তব ভ্রাতৃতরে
আসিয়াছি মোরা হেথা সসৈন্য সদলে,
নতুবা কি অন্য হেতু, এ ট্রয় নগরে
সমবেত গ্রীকগণ ছাড়ি রাজ্যবাস?
মোসবার রণশ্রম শোণিতপাতের
এই কিহে উপযুক্ত প্রতিফল দান?
কি দুঃখ! যাঁহারি কার্য্যে ব্রতী মোরা সবে,
সেই জন হতে অপদস্থ ক্ষতিগ্রস্ত
হইব এরূপে? কাড়ি নিতে বন্দিনীরে
মম, হে দুর্বৃত্ত ধরিছ সাহস,
দেখাইছ ভয়? বহু ঘোর মহাহবে
প্রাণপণে যুঝি লভি জয় পুরস্কার
কদাচও যাহা, জেন হে গর্ব্বিত, তাহা
অধিক সামান্য তব পুরস্কার হতে,
মোর বীরকীর্ত্তি যেইরূপ সর্ব্ব অংশে
তব হতে শ্রেষ্ঠতর, দেখ তুলনীয়া।
প্রতি রণজয়ে হও পুরস্কৃত তুমি
বিনা শ্রমে-হে দুর্বৃত্ত! শ্রেষ্ঠ উপহারে;
আর মোর ভাগ্যে শুধু পরিশ্রম সার।
শুধু হে সামান্য কোন উপহার আমি
লভি ঘোরতর রণশ্রম বিনিময়ে
কিম্বা লভি শূন্যগর্ভ অসার সুখ্যাতি।
কিন্তু জেনো, হে গর্ব্বিত, তব দাস আমি
নহি আর এবে। ত্যজি ট্রয় উপকূল
উজানি জলধিজল যাইব চলিয়া।
ইলিয়ন ভূমে লব্ধ রণজয়ে যত
বিলুণ্ঠিত ধন, পূরাউক সব এবে
আট্রিডিস নৃপতির ভোগ-অভিলাষ।"

(ক্রমশঃ)

দেবী না মানবী।

(১)

"মরণ মঙ্গল গণি তবু কদাচন
নারিব পরকে দিতে স্বামী হেন ধন।"

এইত বঙ্গবামাগণের প্রাণের কথা। বঙ্গীয়া সাধ্বীগণ মরণকে মঙ্গল গণিতে পারেন,—অনায়াসে মরিতে পারেন,—তবু স্বামী সদৃশ অমূল্য ধনকে পরের ভোগ্য করিতে পারেন না। কথাটা শুনিবামাত্র প্রাণ চমকিয়া উঠে,—বড়ই মিষ্ট বোধ হয়; তথাপি উহা কামগন্ধ-বর্জ্জিত নহে। কেননা—

"আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।"
চৈঃ চঃ।

যতক্ষণ আত্মসুখে বাঞ্ছার তৎপরতা থাকিবে, ততক্ষণ তাহার নাম কাম। আর সেই বাঞ্ছা কৃষ্ণসুখপরা হইলে প্রেমাখ্যা ধারণ করে। এখানে কৃষ্ণশব্দে আত্মেতর জীব মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। কেননা—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্
সর্ব্বভূতানি চাত্মানি।"

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে জানা যায়, পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে বিরাজমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিরাজমান হইলেও আপনাকে ব্রহ্মভূত মনে করা নিষিদ্ধ;—কেননা সেরূপ মনে করিলে সেব্য সেবক তত্ত্বে বাধা উপস্থিত হয়। এইরূপ বাধা দ্বারা ভক্তিহানি হয়। এইজন্য উপরিভাগে "আত্মেতর" কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ আত্মসুখ কামনা বর্জ্জিত হইয়া পরের সুখান্বেষণ করাই প্রেমধর্ম্ম। ধর্ম্মরাজ্যে এই প্রেম-ধর্ম্মেরই উচ্চাসন। কিন্তু আধুনিক ধার্ম্মিকমণ্ডলে, বিশেষতঃ রমণীসমাজে এই ধর্ম্মের বড়ই বিরল প্রচার। এই জন্য রমণীচরিত্রে প্রেমধর্ম্ম সন্দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। এইজন্য প্রেমময়ী রমণীকে দেবী কি মানবী বলিব, ঠিক্ করিতে পারি না।

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণজাতীয়া একটী প্রাচীনা রমণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পূর্ণ যৌবনকালের সত্য বিবরণ বিবৃত করিব বলিয়াই উপরে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করিতে হইল। তিনি নিজে পরমা সুন্দরী এবং ঐশ্বর্য্যশালী ও মহাকুলীন কোন সাধুচরিত্র সুন্দর পুরুষের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। স্ত্রী পুরুষে সুদৃঢ় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অপার দাম্পত্যসুখ অনুভব করিতেন। সংসারে কোন অভাব, বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। অসুখের মধ্যে যথাসময়ে পুত্র কন্যার মুখদর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। যদিও হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্র ব্যতিরেকে পুন্নামনরক হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর নাই, তথাপি এই পুরুষটীর তজ্জন্য কোন ক্ষোভ ছিল না। যথাকালে পুত্র সন্তান না জন্মিলে সঙ্গতিমান্ হিন্দু প্রায়ই দারান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের এই পুরুষটী যদিও সঙ্গতিমান্ ও মহাকুলীন ছিলেন,—অনায়াসে আর একটী বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু পতিপরায়ণা সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে সাপত্ন্যদুঃখ প্রদানপূর্ব্বক দারান্তর পরিগ্রহের সঙ্কল্প স্বপ্নেও করিতেন না। পত্নী মধ্যে মধ্যে পতিকে বলিতে লাগিলেন, "আমার পুত্র হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, আমার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনাও নাই;—অতএব আপনি পিতৃবংশ রক্ষা হেতু আর একটী বিবাহ করুন।" পতি, এ বাক্য, পত্নীর মৌখিক মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। পত্নী কখন বলিতেন,—"আমার মনে দুঃখ হইবে বলিয়া আপনি বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছেন না, কিন্তু আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, আপনি আর একটী বিবাহ করিলে, সেই পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া আপনার যত সুখ হইবে,—আপনার সুখে আমিও ততই সুখিনী হইব,—সে পুত্রকে আমি আপনার গর্ভজাত মনে করিব। নববিবাহিতা পত্নীকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় লালন পালন করিব। আমার

সংসার অধিকতর সুখের হইবে। অতএব আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, আপনি আর একটী বিবাহ করুন।” পতি মহাশয়, পত্নীর এই কথা শ্রবণে কেবল হাস্য করিতেন। কখন বা বলিতেন,—

“সতীনের জ্বালা জান না বলিয়াই এখন এত সতীত্ব প্রকাশ করিতেছ। আমাদের বংশলোপ পাউক,—পুন্নাম-নরকে আমার বাসস্থান হউক, তথাপি প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে সতীনের জ্বালা দিতে পারিব না। অতএব তুমি এরূপ বৃথা কথা আর আমাকে বলিও না। দুই জনে পরম সুখে সংসার করিতেছি, এমন সুখের সংসারে কেন অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছ?”

পতির এইরূপ কথার পর হইতে পত্নী বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলেন নাই।

(২)

আমরা যে সামাজিক ইতিহাসের কিয়দংশ প্রথম পরিচ্ছেদে বিবৃত করিলাম, তন্মধ্যে একটী পুরুষ ও একটী রমনীর উল্লেখ আছে। পুরুষটীর নাম রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্ত্রীটীর নাম যোগেশ্বরী দেবী। অতঃপর স্ত্রী পুরুষের নামোল্লেখে গল্প বলিব।

রসময় বাবু কৃষ্ণনগরের জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। কৃষ্ণ-নগরের জজ আদালত গোয়াড়িতে। গোয়াড়ী হইতে নবদ্বীপ তিন ক্রোশেরও কিঞ্চিৎ দূর। সুতরাং রসময় বাবু প্রায়ই বাটী হইতে আদালতে যাতায়াত করিতেন। নিজের গাড়ী ঘোড়া ছিল,—গোয়াড়ীতে একটা নামমাত্র বাসাবাড়ীও ছিল। কালে ভদ্রে ঐ বাসায় অবস্থান করিতেন।

একদা যোগেশ্বরী স্বামীকে প্রাতে ৮টার সময় ভোজন করাইবেন, পূর্ব্বদিন রাত্রে সেই কথা তাঁহাকে বলিলেন। রসময় কহিলেন,—“রোজ ৯টায় আহার দাও, কল্য ৮টায় কেন?”

যোগেশ্বরী কহিলেন,—“কল্য মধ্যাহ্ন-কালে আমার একটু কাজ আছে,—তুমি যতক্ষণ কাছারী না যাইবে, আমি ততক্ষণ সে কাজ পাইব না।”

“উত্তম” বলিয়া রসময় নিদ্রা গেলেন। পরদিন রসময় বাবু ভোজন করিয়া গোয়াড়ি যাত্রা করিবামাত্র যোগেশ্বরী সত্বর আহার সারিয়া লইলেন। পরে যেন বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন, এইরূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইল। দাস দাসীকে আবশ্যক মত উপদেশ দানপূর্ব্বক যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে সংবাদ পাইলেন, বহির্দ্বারে একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—

“ঘটক মহাশয়, মেয়েটী আমার পছন্দ মত হইবে ত?”

ঘটক মহাশয় কহিলেন,—"এ মেয়ে যদি পছন্দ না হয়, তবে পছন্দ হইবার মেয়ে জগতে নাই।"

"বাবু বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমরা ফিরিতে পারিব?"

"যে অসুরের স্থায় ষোল জন বেহারা ও দুইখান পালকী দরজায় উপস্থিত হইল, আমাদের যাতায়াত ও সেখানকার কার্য্য সারিতে বোধ হয় চারি ঘন্টার অধিক লাগিবে না।"

"তবে কোন চিন্তা নাই,—যাত্রা করুন,—আমি প্রস্তুত" বলিয়া যোগেশ্বরী আপনি এক পাল্‌কীতে আরোহণ করিলেন, এবং ঘটক মহাশয় অন্ত পাল্‌কীতে চড়িয়া বসিলেন। যোজন-কর্ত্তা ঘটকগণের পাত্র-কন্যার যোজনা করিবার জন্ত হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের বন্ধন ছিন্ন ও পদতল কাঁকুড়ফাটা হইয়া যায়। আজ সেই ঘটক মহাশয় পাল্‌কীতে চড়িয়া অপূর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। বাহকগণ "হুঁ হুঁ" শব্দে তীরবেগে ছুটিল।

যোগেশ্বরী পুনঃ পুনঃ স্বামীকে বিবাহের অনুরোধ করিয়া যখন কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন অন্য উপায় চিন্তনে ব্যাপৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই চিন্তার ফলে মধ্যে মধ্যে রসময়ের আত্মীয় স্বজনগণ বংশলোপের ও পুন্নাম-নরকবাসের ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দার-পরিগ্রহে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ২।৪টী ঘটক রসময় বাবুর সম্মুখে মধ্যে মধ্যে পরমা সুন্দরী অনূঢ়া কন্যাগণের রূপ যৌবন বর্ণন করিতে লাগিলেন। রসময় ধর্ম্মভঙ্গ কুলীনের পুত্র; সুতরাং অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের রূপ যৌবনের প্রলোভন, ভূরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য রজত মুদ্রার ভারে ভারায়মান হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট কামিনী কাঞ্চন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। "বিবাহ করিলে যোগেশ্বরীর মনে দুঃখ হইবে" এই যুক্তির স্রোতে সকলই ভাসিয়া গেল। রসময় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে কোনরূপেই সম্মত হইলেন না। তখন যোগেশ্বরী বলপূর্ব্বক স্বামীর বিবাহ দিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আজ ঘটকের সহিত স্বামীর জন্য নিজে মেয়ে দেখিতে যাত্রা করিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া পাত্রী দেখিলেন। আপনি পরম রূপবতী হইয়াও পাত্রীর রূপে মুগ্ধা হইলেন। ভাবিলেন,—

"এই স্ত্রীরত্ন পাইলে আমার প্রাণেশ্বর পরম সুখী হইবেন।" স্বীয় গাত্র হইতে একখানি বহুমূল্য আভরণ উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর কন্যাকর্ত্তার দ্বারা একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করাইলেন। বিবাহের দিন মধ্যাহ্নকালে কন্যাকর্ত্তা পাত্রীকে লইয়া অতি গোপনে যোগেশ্বরীর ভবনে উপস্থিত হইবেন, সেই দিন ইহাও স্থির

হইল। যোগেশ্বরী ঘটক সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

যোগেশ্বরীর যোগচক্রে পতিত হইয়া রসময় বাবু নির্দ্দিষ্ট দিনেষ রজনীযোগে স্বন্ধরনস্থ শয়নগৃহে দ্বিতীয় দারের পাণি-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইবামাত্র যোগেশ্বরী সেই সম্প্রদান আসনে উপবেশন ও গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক নবোঢ়া সপত্নীর দুই পাণিতল আপন বাম হস্তে ধরিলেন এবং স্বামীর দুই পাণিতল দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া "প্রিয় ভগ্নি, আমি চির-জীবনের জন্য আমার এই প্রাণ স্বামী তোমাকে সমর্পণ করিলাম। আজ হইতে তুমি ইহাঁর ভোগ্যা ধর্ম্মপত্নী হইলে এবং আমি তোমাদের উভয়েরই সেবাদাসী রহিলাম।" এই বাক্য বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত সপত্নীর যুগল করে অর্পণ করিলেন।

রসময় বাবুর পদ্মপলাশ নয়নযুগল হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল ;—কিন্তু যোগেশ্বরীর সহাস্য বদন, —অতি মহান্ ধর্ম্ম কার্য্যসম্পাদনের পর মানবমনে যেরূপ আত্মপ্রসাদ হইয়া থাকে,—যোগেশ্বরীর বদনকমল সেইরূপ আত্মপ্রসাদে সুপ্রসন্ন।

রমণীগণ আপন গর্ভজাত কন্যা, বা কনিষ্ঠা সহোদরাগণকে যেরূপ স্নেহ ও মমতার সহিত লালন পালন ও তাহাদের বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, যোগেশ্বরী নবীনা সপত্নীকে সেইরূপ লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সপত্নী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। যোগেশ্বরী যেন পূর্ণিমার চাঁদ হাতে পাইলেন। এতদিনে যোগেশ্বরীর যোগ সিদ্ধ হইল।

গর্ভধারিণীর সহিত এই বালকের কোন সম্বন্ধ ছিল না। যোগেশ্বরী সূতিকাগারেই বালককে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে গর্ভধারিণীর স্তনপান করাইয়া লইতেন। এই শিশুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদিন গর্ভধারিণী শিশুর গায় হাত তুলিয়াছিলেন। যোগেশ্বরী দাস দাসী সত্বেও স্বহস্তে গো-শালা পরিষ্কার করিতেন। তখন ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালকের রোদনধ্বনি শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। রোদনের কারণ অবগত হইবামাত্র সেই গোবর-হস্তে সপত্নীর কপোলে একটী চপেটাঘাত করিলেন এবং কহিলেন,—

"তুই আমার ছেলে মারিবার কে ? তুই জানিস্ না যে, এই ধন পাবার জন্য চিরজীবন স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়াছি ? এই শিশু আমার স্বামিকুলের বংশধর,—ইহার জন্যই আমার প্রাণের অধিক প্রিয়-বস্তু তোকে বিলাইয়া দিয়া তোর দাসীত্ব করিতেছি ?" এই কথা বলিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শিশুকে শান্ত করিলেন এবং সত্বর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন।

এই সকল ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের মুখে শ্রবণ

করিয়াই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। অতএব ইহা,দুর্গেশনন্দিনীর হস্তে আয়েসার জগৎ সিংহ সমর্পণের ন্যায় কল্পিত কথা নহে এবং এতাদৃশ উৎকট অসাধ্য সাধনের পর অনুতাপানলে, অথবা সপত্নী-বিদ্বেষের মুর্ম্মুর দাহে-দগ্ধ হইয়া যেগেশ্বরী স্বকীয় জীবনের মধ্যে কথনই হীরকাঙ্গুরীয় ভক্ষণ করিতে যান নাই;—চিরকাল সমান সুখে ও পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রাণেশ্বরের সহিত চিরকাল এক গৃহে বাস করিয়াছেন,—অথচ সপত্নীহস্তে স্বামী সমর্পণের সময় হইতে একদিন ভ্রমেও স্বামীর শয়নগৃহে গমন, কি স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। সপত্নীর দ্বারা সযত্নে স্বামিসেবা সাধন করিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—"দেবী, না মানবী?"

আদর্শ হিন্দু পরিবার।

(গত প্রকাশিতের পর)

ভগিনীর বিবাহে ব্রাহ্মণ স্ত্রীর অলঙ্কার উৎসর্গ করিয়াও কিছু ঋণগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু স্ত্রীর গুণে ও ভগবানের কৃপায় সে দায় হইতে শীঘ্র মুক্ত হইলেন। গৃহিণী স্বামীর ঋণ পরিশোধ জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্বে যে ভাবে পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহার দ্বিগুণ করিতে লাগিলেন। যতদুর সাধ্য অল্প ব্যয়ে সংসার চালাইতে লাগিলেন। বাজারের শাক সবজি ক্রয় করিতে বেশী পয়সা ব্যয় হয় বলিয়া চারি টাকা বেতনে একজন মালী রাখিলেন, ইহাতে বাড়ীতেই সকল শাক সবজি ও আলু বেগুণ হইত। এবং ধান কিনিয়া তাহাতে চাউল প্রস্তুত করাইলেন। এইরূপে সংসারের সকল ব্যয় কমিয়া গেল। প্রথমতঃ বাগান প্রস্তুত করিতে যদিও কিছু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সেই ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইল। পরিবারের আহারের উপযোগী ফল মূল রাখিয়া মাসে প্রায় ৫।৬ টাকার ফল মূল বিক্রয় হইত ও গৃহিণী অল্পব্যয়ে সংসার চালাইয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঋণের দায়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি কায়মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেন। এইরূপে তাঁহাদের ঋণের সামান্য কিছু পরিশোধ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে, কোন সাংঘাতিক রোগে ব্রাহ্মণের ভগ্নীটি মারা গিয়াছে, এবং সে নিঃসন্তান থাকায় তাহার সেই মাতৃদত্ত সম্পত্তি সমস্ত ভ্রাতাকে দানপত্র করিয়া দিয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এমন কি প্রায় মাসাবধি তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্নজল গ্রহণ করেন নাই এবং শোকে সর্ব্ববিধ সুখ ও আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে এই

দুরবস্থার সময় এত সম্পত্তি পাইলেন, সেজন্য কিছু মাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না বা তাহা আপনাদের সচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিলেন না। উক্ত সম্পত্তি দ্বারা একটী ছোট অতিথিশালা ভগিনীর স্মরণার্থ প্রস্তুত করাইলেন। সেই অতিথিশালাতে প্রত্যহ ১০টি দীন দরিদ্র অন্ন পাইত।

ভগ্নীর পরকালের হিতার্থ এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিয়া গ্রামবাসী সকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা ও তাঁহার ভক্তের প্রতি করুণা! যে তাঁহাকে একবার কায়মনে ডাকে, তিনি তাহার প্রতি সদয় না হইয়া থাকিতে পারেন না এবং সত্বর তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। এই জন্য ভগবানের নাম বিপদভঞ্জন। এই ব্রাহ্মণ কায়মনে ভগবানে ভক্তি করিতেন, অধর্ম্মাচরণে কখনও অগ্রসর হইতেন না, সেইজন্য ঈশ্বর ইহাঁর উপর এত দয়া করিয়াছিলেন। এই অতিথিশালা প্রস্তুত হইবার দুই মাস পরেই ইহাঁর বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা চারি গুণ বাড়িল। ইহাঁর বিশ্বস্ততা ও ধর্ম্মভীরুতা এবং পরোপকারিতার কথা অনেকেই জানিতেন এবং অনেকগুলি সন্তান অল্প আয়ে প্রতিপালন করিতে হয় ও তাহাতে ইহাঁদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, ইহা সকলেই জানিতেন; এবং যাহাতে ইহাঁর কিছু বেশী আয় হইয়া একটু সচ্ছলতা হয় এজন্য সকলেই চেষ্টা করিতেন। ভাগ্যক্রমে যে স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করিতেন, সেই স্থানে একটী উচ্চ বেতনের কর্ম্ম খালি হওয়াতে অনেকেই ইহাঁর পক্ষ সমর্থন করিলেন। ব্রাহ্মণের চেষ্টা ও পরিশ্রমে এবং ঈশ্বরের কৃপায় এক কালে ১৫০ টাকা বেতনের কর্ম্ম তাঁহার হইল। তাঁহাকে এই কর্ম্ম দিতে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন আপত্তি করিলেন না, বরং উপযুক্ত লোককে এই কর্ম্ম দেওয়া হইল বলিয়া সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলেন।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এত দিনে ইহাঁদের কষ্টের কিছু লাঘব হইল। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা আয় চতুর্গুণ হইল বলিয়া ইহাঁরা গর্ব্বিত হইলেন না। পূর্ব্বে গৃহিণী যেরূপ শ্রমশীলা, নম্র ও পরদুঃখ-কাতরা ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিলেন। উচ্চ বেতনভোগী স্বামীর স্ত্রী বলিয়া গর্ব্বিতা অথবা বিলাসপ্রিয়া হইলেন না। পূর্ব্বে যেরূপ শত কষ্ট হইলেও স্বামীকে জানাইতেন না, এখনও সেইরূপ নিজ সুখের জন্য অথবা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য একটী কথাও স্বামীকে বলিতেন না। যদিও স্ত্রী স্বামীকে কখনও নিজের বিষয়ে কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামী সকলই জানিতে পারিতেন। আয়ের অল্পতা হেতু স্ত্রীকে যে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিতে হইত, এমন কি তাঁহার দুই সন্ধ্যা ভাল করিয়া আহার পর্য্যন্তও হইত না, ইহা স্বামী জানিতেন। সেইজন্য মনে মনে বড় কষ্ট ছিল। এমন পতিব্রতা ও সর্ব্বগুণ

শালিনী স্ত্রীকে যে তিনি সুখে রাখিতে পারিতেছেন না, সেজন্য বড়ই দুঃখিত ছিলেন ও সেই দুঃখ কেবল ভগবান্‌কে জানাইতেন। এখন বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে স্ত্রীর কষ্টের লাঘব জন্য ২।৩ জন দাস দাসী রাখিয়া দিলেন এবং অল্প দিন মধ্যে পূর্ব্বের ঋণ সকল পরিশোধ করিলেন। দাস দাসী দ্বারা সাংসারিক অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল, ইহাতে গৃহিণী অবসর লাভ করিলেন। কিন্তু সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া আলস্যে তিলমাত্র কাল কাটান নাই। তাস পাশা খেলিয়া এবং পাড়া বেড়াইয়াও বেড়ান নাই, অথবা সকল কর্ম্ম ভৃত্যদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার কার্য্যের নূতন প্রণালীর বিষয় পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের উপায় সম্বন্ধে নানা জনের নানা প্রকার মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ইচ্ছুক; কেহ কেহ তাহাদিগকে স্বাবলম্বন-পরায়ণা করিয়া জীবিকার উপায় বিধানে অভিলাষী। আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহাদিগের জীবিকালাভের যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণঃ বিধবাগণ উপবীত কাটিয়া, এবং অন্যান্য বিধবা ও অনাথা স্ত্রীগণ ধান ভানিয়া, চরকা দ্বারা সূতা কাটিয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা ও অন্য প্রকারে শরীর খাটাইয়া, কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আজ কাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও সামাজিক নিয়মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান রুচি ও সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সমাজসম্মত হইতে পারে, এমন ভাবেই উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষায় যেমন জীবিকালাভের পথ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেয়, এমন আর কিছুতেই নয়। শিক্ষা যে কেবল জীবিকা বিধান করিয়াই নিরস্ত হয়, এমন নহে; ইহাতে চরিত্র গঠিত এবং শারীরিক মানসিক, ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ব প্রকার সুখ সাধিত হইতে পারে। যাহা হইতে উপজীবিকা ও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে, এমন সুখের বাণিজ্য কে

পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? দুঃখের কথা কি বলিব? শুধু ভারতে দুঃখ-দুন্দুভি বাজাইয়া আর কি করিব? যে ভারতবাসীর হৃদয় থাকিয়াও নাই, স্ত্রীলোকের সুখ দুঃখ—বিশেষতঃ বিধবা নারীর সুখ দুঃখ "সুখ দুঃখ" বলিয়া যাঁহাদের ধারণা নাই, তাঁহাদের নিকট স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা করিলে কি হইবে? যাহাহউক ভারতে আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষা কথঞ্চিৎ প্রচলিত হওয়াতে আমরা আশ্বস্ত হইতেছি এবং যে ভাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথ স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের উপায় সংগৃহীত করিব, তাহাতে আশা করি সমাজ আমাদের প্রতি কোনরূপই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধেও নানা জনের নানা মত। ইহার মধ্যে সমাজের যে মত, অনেকটা তন্মতেই চলিতে হইবে। আমরাও বলি না যে, স্ত্রীলোকে কেরাণীগিরি করিবে। তাহারা শিক্ষিতা হইয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, পত্রিকা-সম্পাদিকা, গ্রন্থকর্ত্রী, প্রসবাদি-কার্য্যের ধাত্রী ও স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসিকা হইলে, তাহাদের জীবিকা-লাভের উপায় অতি সহজেই হইতে পারে এবং ইহাতে সমাজেরও কোন অনিষ্ট বা দোষের কারণ দেখা যায় না।

ইহার পরেই শিল্পবিভাগ। শিল্প-ক্ষেত্রে উক্তবিধ স্ত্রীলোকের জীবিকা-লাভের যতগুলি উপায় আশা করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই না। শিল্পজাত দ্রব্যে যেরূপ আয় হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আসামে এরেণ্ডীনামক এক প্রকার বিখ্যাত শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা আসামীয়া স্ত্রীলোকদের নির্ম্মিত। এক এক খানা এরেণ্ডীর দাম ১০৲, ১৫৲, ২০৲ টাকা, কি তদধিক হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মুগার কাপড়, হুতার, বড় কাপড়া নামক গাত্র বস্ত্র তাহাদের হস্তে নির্ম্মিত হইয়া যথেষ্ট লাভ হয়। ব্যাধ বা ডোম এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। তাহারা সস্ত্রীক নানা স্থানে যাইয়া বাঁশের কার্য্য করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, একটী বাঁশে ৫৲ টাকা আয় না হইলে, তাহারা আর সে স্থানে থাকে না। ফলতঃ বাঁশনির্ম্মিত সামান্য ডালা, চুপড়ী, সাজি ইত্যাদিতে তাহাদের যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ প্রবাদ কখনও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীগণ সকলেই এইরূপ আসামীয়া স্ত্রীলোক ও ব্যাধ-রমণীর অনুকরণ করিলে, জীবিকা-লাভের জন্য কখনই তাহাদিগকে হাহাকার করিতে হয় না। নিম্নলিখিত শিল্প সকল হইতে ভারতের বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের উপজীবিকা লাভ হইতে পারে ; যথা,—বস্ত্রবুনন, কাপড়ে বুটা উঠান, পিরাণ চাপকান ইত্যাদি সূচীকর্ম্ম ; মোজা, টুপি, কম্ফোর্টার নির্ম্মাণাদি উলের কাজ ; কাগজে নানা প্রকার ছবি অঙ্কনাদি চিত্রবিদ্যা ও ঝাড় লতা পাতা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে কাগজ কাটা ; মাটী দ্বারা

নানা প্রকার খেলনা ও বাসন তৈয়ার; পাটি নির্ম্মাণ, ঝুড়ি, ডালা, কুলা, সাজি, ধুচনী, ইত্যাদি বাঁশের জিনিশ প্রস্তুত করা।

কা, চ, র।

জীবনবিকাশ।

স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জীবনবিকাশ সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই আমাদের অধিকার নাই সত্য; কিন্তু একবারেই যে কোন অধিকার নাই, কিছু করিবার নাই, কোন যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। জীবনবিকাশেও আমাদের যত্ন চেষ্টা, চিন্তা ও পরিশ্রম প্রয়োজন। নিজ যত্ন চেষ্টা ভিন্ন জীবনের আশানুরূপ বিকাশ অসম্ভব। আমি যদি যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম পূর্ব্বক আহার সংগ্রহ না করি এবং সেই আহার গ্রহণে যদি বিরত থাকি, তবে কি স্বভাবের প্রভাবে শরীরের বিকাশ হইতে পারে? তাহা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি নিজ জীবনের জন্য নিজে পরিশ্রম না করিলে, নিজের উন্নতির জন্য নিজের যত্ন চেষ্টা না থাকিলে, কেবল স্বভাবের প্রভাবেই জীবনের উপযুক্ত বিকাশ ও উন্নতি হইতে পারে না। স্বভাবের প্রভাব ভিন্ন যেমন আমার দেহ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও বর্দ্ধিত হয় না, তেমনি নিজ যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম ভিন্নও দেহমন প্রাণের উন্নতি সম্ভবপর নহে। পার্থক্য এই যে, আপন যত্ন চেষ্টার অভাবে দেহের মৃত্যু সংঘটিত হয়, কিন্তু তদভাবে আত্মার মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে না। তাহাও এইজন্য যে আত্মা অমর। আমাদের চেষ্টা যত্নের অভাবে আত্মা জীবিত থাকে, কিন্তু তাহার বিকাশক্রিয়া ভালরূপে চলিতে পারে না।

শরীর বিকাশের জন্য প্রধানতঃ তিনটী কার্য্যের প্রয়োজন—(১) আহার গ্রহণ, (২) তাহা জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করণ অর্থাৎ দেহ-পোষণোপযোগী রক্ত মাংসে পরিণত করণ, (৩) আপন শক্তি বিকিরণ অর্থাৎ বিবিধ কার্য্যে শক্তি চালনা। ইহার কোনও ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই দেহের বিকাশ হয় না। মানবজীবন সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ। গ্রহণ, ধারণ ও বিতরণ এই তিন ক্রিয়া সুন্দররূপে না চলিলে আত্মার বিকাশ সাধিত হইতে পারে না।

তাই দেখিতেছি জীবনের বিকাশে আমাদের প্রথম কার্য্য আহার গ্রহণ। আমরা জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা দ্বারা গঠিত, সুতরাং আমাদের আহার জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা। যে সত্য—যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি একবার চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব জীবনোপযোগী কত সত্য—কত

শিক্ষা, কত সময় কত ভাবে পাইয়াছি, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা অতি অনুন্নত অসম্পূর্ণ; তবুও যে সকল শিক্ষা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও যদি গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে জীবন আজ এত বিকৃত ও অগঠিত থাকিত না। চারি দিকে আত্মার যে সকল আহারীয় বস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যত আমরা কোন চেষ্টাই করি না। আমাদের কোনওরূপ চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াও যে সকল জ্ঞান আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, আলস্য ও উদাসীনতা বশতঃ তাহাও গ্রহণ করি না। এই অবস্থায় জীবনের বিকাশ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনাহারজনিত ক্ষীণতা ও অসম্পূর্ণতা। এই শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটির অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের হীন মলিন অবিকশিত জীবন।

জীবনবিকাশের প্রথম উপায় "গ্রহণ" সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল গ্রহণ করিলেই হইবে না, তাহা পোষণোপযোগী হওয়া চাই। গ্রহণের অভাবে যেরূপ মৃত্যু, মন্দ বস্তু গ্রহণেও সেইরূপ মৃত্যু। অনিষ্টকর জল বাতাস ও খাদ্য যদি গ্রহণ করি, তবে আমার শরীর পুষ্ট হইবে না, বরং বিনষ্ট হইবে। মন্দ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মানবাত্মা বিকাশের পথে না যাইয়া বিনাশের পথেই যায়। আত্মার স্বভাবই গ্রহণ করা—ভাল হউক মন্দ হউক, সে কিছু গ্রহণ করিবেই। এই দুইয়ের ফল অবশ্য দুই বিভিন্ন প্রকার। অতএব সর্ব্বদা আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে ভাল মন্দ বিচারশক্তি পাইয়া, কিসে ইষ্ট আর কিসে অনিষ্ট হয় তাহা জানিয়া কে মন্দ বিষয়—অনিষ্টকারী বস্তু গ্রহণ করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় আপাত-মধুর সুখে ভুলিয়া আমরা অধিকাংশ সময়েই অহিতকর বস্তু আস্বাদন করি, কুশিক্ষা গ্রহণ করি। অসার অনিষ্টকর বস্তু গ্রহণ করিতে করিতে সে সকল বস্তুই আমাদের প্রিয় ও তৃপ্তিকর হইয়াছে, সারগ্রাহিতা শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা জানিয়া শুনিয়াও মন্দ বস্তুই অধিক গ্রহণ করিতেছি এবং এই কুশিক্ষার ফলে জীবন বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বস্থান হইতে যাহা কল্যাণকর তাহাই গ্রহণীয়। সূর্য্য যেমন পঙ্কিল দূষিত স্থান হইতেও কল্যাণপ্রদ নির্ম্মল সলিল-কণা গ্রহণ করে, আমরা যদি সেইরূপ সকল অবস্থা হইতে, সকল মানবজীবন, সকল গ্রন্থ এবং জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে নির্ম্মল সার বস্তু গ্রহণ করিতে পারি, সৎশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, তবে কতই না উপকৃত হইতে পারি, তাহাতে জীবন কতই না উন্নত ও বিকশিত হইতে পারে!

কেবল পোষণোপযোগী বস্তু গ্রহণ করিলেই হইবে না, তাহা আপনার উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, নতুবা

পোষণ অসম্ভব। যদি খাদ্য শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা শরীরের প্রধান উপাদান রক্ত মাংসে পরিণত না হয়, তবে শুধু পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে শরীর কখনও পুষ্ট হয় না। জীবন-বিকাশ সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধু সাধ্বী নর নারী দর্শন, তাঁহাদের জীবনী অধ্যয়ন, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব, জগৎ হইতে অপরাপর প্রকারে বিবিধ শিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে কি ফল হইবে, যদি তাহা আমার আয়ত্ত করিতে না পারি, জীবনের রক্তে—আপনার বস্তুতে পরিণত করিতে না পারি? কত জ্ঞান আমরা উপর উপর শিক্ষা করি, কত তত্ত্ব কথা ভাসা ভাসা মুখে বলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা আমাদের জীবনের মূলে প্রবেশ করে না। সুতরাং ইহাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না, বিকশিত হয় না। পল্লবগ্রাহিতা আমাদের জীবন-বিকাশের প্রধান অন্তরায়।

আবার কেবল গ্রহণ ও ধারণ ক্রিয়া সুন্দররূপে চলিলেই উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না, বিতরণ আবশ্যক। শরীর-চালনা না করিলে—শক্তি ব্যয় না করিলে শরীরের বিকাশ হয় না—শরীর পুষ্ট ও সবল হয় না। আত্মার পক্ষেও বিতরণ প্রয়োজনীয় এবং তাহাই আত্মার স্বভাব। আমি জগৎ হইতে কেবল গ্রহণ করিব, কিন্তু কিছু দিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না—এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেও পারি না। তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, কারণ এই স্বাভাবিক কার্য্যে বাধা দিবার শক্তি ও অধিকার আমার নাই। বিতরণ আমার স্বভাব, তাই যাহা গ্রহণ করিব, তাহাইত দিতে সক্ষম হইব। যাহা গ্রহণ করি নাই, তাহা কিরূপে দিব? এই স্থানেই সমস্ত জগতের সহিত,—সমস্ত মানবমণ্ডলীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ এবং এই স্থানেই নিজের উন্নতির সহিত অপরের উন্নতি গ্রথিত। আমি যদি কল্যাণকর পদার্থ গ্রহণ করি, আমা দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না। আর যদি নিজে অকল্যাণকর পদার্থ গ্রহণ করি, নিশ্চয় অপরের অমঙ্গল সাধন করিব। নিজের পাপে কেবল নিজেই বিনষ্ট হইব না, অপর সকলকেও বিনষ্ট করিব। সূর্য্য নির্ম্মল সলিল গ্রহণ করে বলিয়া পৃথিবীর এবং প্রাণিগণের এত মঙ্গল সাধন করিতে পারে। যদি উহা দূষিত বিষাক্ত জল গ্রহণ করিত, তবে এই কল্যাণের পরিবর্ত্তে ঘোরতর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত। যেখানে দূষিত পদার্থ নাই, সেখানেও দূষিত বারি বর্ষণ করিয়া জগৎকে মরু তুল্য করিত। তখন পৃথিবী আর "সুজলা সুফলা" থাকিত না। তবেই দেখিতে পাই আমার জীবনের অবনতিতে কেবল যে আমার নিজেরই অবনতি তাহা নহে, সমস্ত জগতের অবনতি। যে হৃদয়ে হয় ত কত সুন্দর সদ্‌গুণ ফুটিতে পারিত, আমার সংস্পর্শে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কি ভয়ানক কথা! নিজে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে পারি, কিন্তু সে কুঠার যে কত প্রিয় বৃক্ষকে ছেদন করিবে তাহা কি একবার ভাবি?

তাহাদিগকে ছেদন করিবার আমার কি অধিকার আছে? যাহাদের কোনরূপ কষ্ট হইলে প্রাণে বিষম আঘাত পাই, তাহাদের জীবনের মূল আমাদের দ্বারা এরূপ আহত হইতেছে এবং হইবে ইহা জানিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তবে প্রেম কিসের? মায়া মমতা কিসের? কেবল কি নশ্বর শরীরের জন্যই মায়া? ইহারই কি এত মূল্য? অনন্ত জীবনের—অক্ষয় নিত্য জীবনের কি কোন মূল্য নাই? পৃথিবীর কোন মূল্যবান্ পদার্থের সহিত যে জীবনের মূল্যের তুলনা হয় না, এমন অমূল্য জীবন কি আমাদের নিকট এতই তুচ্ছ? তাহা হইলে কেন না জগৎ আমাদিগকে অসার বলিয়া তুচ্ছ করিবে?

শক্তি চালনা দ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। কোন এক অঙ্গ চালনা করিলে কেবল তাহারই উন্নতি ও বিকাশ হয়। যে অঙ্গের বিতরণ ক্রিয়া বন্ধ করি, ক্রমে তাহার পোষণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া আইসে এবং তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য ও বিকল হইয়া যায়। যাঁহারা উর্দ্ধবাহু হন, তাঁহাদের শুষ্ক হস্ত দেখিয়া আমরা ইহার ফল প্রত্যক্ষ করি। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, দীর্ঘকাল অন্ধকারপূর্ণ কুঠরীতে থাকিয়া অনেকে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে শক্তি অপরের জন্য ব্যয় করিব, তাহাই বৃদ্ধি পাইবে, তাহারই বিকাশ হইবে; আর যাহার চালনা করিব না, পোষণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া তাহা কার্য্যের অযোগ্য ও বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তি অপরের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যত আমরা অপরের জন্য খাটিব, ততই বিকাশ প্রাপ্ত হইব—উন্নত হইব। পরের সেবাতে আপনারই সেবা, পরের স্বার্থ সাধন করিতে যাইয়া আপনার স্বার্থ সাধনই করি। বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য নিয়ম! যে ব্যক্তি শরীরক্ষয় হইবে ভয় করিয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিবে, তাহার শরীর অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আর যে আপন শরীরক্ষয়ের ভয় না করিয়া পর-সেবাতে শরীরপাত করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারই শরীর রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। যে আপন সুখ—আপন সুবিধা অন্বেষণ করিয়া চলিবে, তাহার সব সুখ বিনষ্ট হইবে। আর যে আপনাকে ভুলিয়া অপরের জন্য জীবন বিসর্জন করিবে, তাহার জীবনই রক্ষিত ও বিকশিত হইবে—তাহার আনন্দ শান্তিই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত হইবে। এইজন্য মহাত্মা যিশু বলিয়াছেন "যে জীবন চাহিবে, সে জীবন হারাইবে, আর যে জীবন হারাইবে, সে জীবন পাইবে।" মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার এইরূপই বিধি।

গ্রহণ, ধারণ ও বিতরণ ইহার একটী ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে সকল ক্রিয়া বন্ধ হয়। ইহাদের পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং আমাদিগকে তিনটি উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। কোনটী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

বিকাশ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞানের কোনও অভাব নাই। নিজে অসম্পূর্ণ ও জীবনের বিকাশ বিষয়ে উদাসীন হইলেও কোন্ জীবন উন্নত, কোন্ জীবন কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বেশ বুঝি। বিকাশের উপায়ও আমরা জানি। জ্ঞান প্রেম পবিত্রতায় উন্নত—ধৈর্য্য, ক্ষমা, সরলতা, সহিষ্ণুতা,তেজস্বিতা, স্বাধীনতা, কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত জীবনকে কে না সম্মান করে? ইহা লাভ করিতে যে সকল সাধন প্রয়োজন, তাহাই বা আমরা কে না জানি? কিন্তু শুধু বুঝিলে বা জানিলে কি হয়? কেবল কি কোন্ খাদ্য দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, কাহার শরীর সুস্থ ও সবল ইহা জানিলেই আমার দেহ পুষ্ট, সুস্থ ও সবল হইবে? তাহা নহে। আমি যাহাতে সে সকল খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যাহার ক্ষুধা নাই—অভাব বোধ নাই—অসুস্থ বিকল দেহ বহন করিয়া কোন কষ্ট নাই, সে আহার গ্রহণ করিতে যাইবে কেন? স্বাস্থ্যলাভ করিতে যত্ন করিবে কেন? রুগ্ন বিকল দেহ লইয়া যদি কেহ আপনাকে সুখী ও সচ্ছন্দ মনে করে, তবে তাহাকে কি আমরা প্রকৃতিস্থ মনে করি? কখনই না। কিন্তু আমরাও সর্ব্বদাই রুগ্ন বিকল জীবন লইয়া সুখী আছি। তবে আমরাও কি অপ্রকৃতিস্থ নহি? আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নাই, ক্ষুধা নাই, অভাব ও কষ্ট বোধ নাই, ইহা অসম্পূর্ণ বিকল জীবনের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে। জীবনের উপযুক্ত বিকাশ যেরূপ সুস্থ অবস্থার লক্ষণ, ক্ষুধা ও অভাব বোধও সেইরূপ সুস্থাবস্থার একটী প্রধান লক্ষণ। ক্ষুধাতেই দেহ সুস্থ ও সবল হয় এবং সুস্থ ও সবল ব্যক্তিরই ক্ষুধা প্রবল। অভাববোধজনিত ব্যাকুলতাতেই আত্মার বিকাশ হয় এবং আত্মার বিকাশে আবার অভাব বোধ বৃদ্ধি হয়। এই ব্যাকুলতা হইতেই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মজীবনই প্রকৃত বিকশিত জীবন। সুতরাং এই অভাবজনিত ব্যাকুলতা বা ক্ষুধা আমাদিগের জীবনবিকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

আমরা জীবনের জন্য না ভাবিলেও এমন একজন আছেন, যিনি জীবনের জন্য সর্ব্বদা ভাবিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন। জীবনের দিকে দৃষ্টি গেলেই যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের জন্য কার্য্য করিতেছেন, জীবনের মূলে 'জীবনের জীবন' হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কাছে না যাইয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন জীবনের গঠন, জীবনের উন্নতি ও বিকাশ সাধন অসম্ভব। নিজের দুর্ব্বলতা ও উদাসীনতার জন্য নিরাশ হইবার বিষয় নাই, তিনি সর্ব্বদা সহায় আছেন। সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া সকল শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার করুণাতেই জীবন বিকাশ প্রাপ্ত

হয়—সুস্থ সবল ও সুন্দর হয়। যাঁহার করুণার ছায়ায় প্রতি মুহূর্ত্তে কত যত্নে রহিয়াছি, তিনিই জীবন পরিবর্দ্ধন ও তাহার উন্নতি সাধন করিবেন। তিনিই সকল বাধা দূর করিবেন। যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিবেন। আমরা তাঁহাতে আশা ও নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক আমাদের কাজ করিয়া যাই, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করিয়া যাই, ফলদাতা তিনি সময়ে ফল প্রদান করিবেন। তিনি আমাদের সহায় হউন। আমরা সকল ভগিনী তাঁহার করুণায় জীবন প্রাপ্ত হই, সুখী হই। তাঁহার করুণাচ্ছায়ায় ও স্নেহ-সলিলসেকে আমাদের জীবনতরু দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তিনিই জয়যুক্ত হউন।

দেবী জগন্মোহিনী।

ভারত-গৌরব স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী পতিবিয়োগের পর প্রায় ১৪ বৎসর কাল বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গত ১৮ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার সময় মর্ত্তাধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে স্বামীদেবের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর তিনি স্বামীদেবের ন্যায় বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন। পরিশেষে পৃষ্ঠদেশে এক সাংঘাতিক বিস্ফোটক হইয়া ইঁহার প্রাণাত্যয় সংঘটন করিল। ইনি ৫টী পুত্র ও ৫টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র সেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি। মাতৃবিয়োগে সন্তানগণ এককালে পিতৃমাতৃবিয়োগ-শোকের উচ্ছ্বাসে মগ্ন হইয়াছেন। আমরা এই ঘটনায় তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া অন্তরের শোক প্রকাশ করিতেছি।

জগন্মোহিনী দেবী বালীনিবাসী ৺চন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের জেষ্ঠ্যা কন্যা ছিলেন। ইনি যেরূপ রূপবতী, সেইরূপ সরলা, সহৃদয়া ও সদ্‌গুণবতীও ছিলেন। ইঁহার বয়স যখন নয় বৎসর, আঠার বৎসর বয়স্ক যুবক কেশব চন্দ্রের সহিত ইঁহার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। ইনি নিজের রচিত পদ্যে আপনার যে বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"বাল্যকালে হয় মনে আনন্দ কতই,—
পাতায়েছিলাম গঙ্গাজল আর সই
আতর গোলাপ আর বেগুনের ফুল।

* * * *

কুড়াতে যেতাম প্রাতে কুল আর ফুল,
দাঁডাইয়ে হাসিতাম যথা বৃক্ষমূল।
মনসাধে খেলিতাম খেলাঘর করি,
দিতাম পুতুল-বিয়ে কত ঘটা করি।
জামাতা বধূরে লয়ে বড়ই পছন্দ,

ধূলা কাদা লয়ে খেলা এতই আনন্দ।
গুরুজনে বলিতেন কি তোদের খেলা,
নাহিক বুঝিস্ তোরা প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলা।
বাড়ীতে পূজার ঘটা অতি ধুমধাম,
কি পরিব কি খাইব এই মনস্কাম।
নব বস্ত্র অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত,
বালিকা বয়সে আমি নব-বিবাহিত।
ছাগবলি হেরি প্রাণ হত কম্পমান,
ভাবিতাম ইহাদের নিষ্ঠুর পরাণ!
অঞ্জলি দিবার সাধ বড় ছিল মনে,
ছোট বলি কেহ নাহি লইতেন সনে।
যাইত যখন সবে পুকুরের ধারে,
বলিতাম লয়ে যাও মোরে পর পারে।
আত্মীয় স্বজনে লয়ে যেত পিঠে করে,
পিসী মাসী সবে মিলে আমারে আদরে।
কুমারী ছিলাম যবে বালিকা হইয়া,
মনসুখে বেড়াতাম সঙ্গিনী লইয়া।
ফুলমধুপান করি মিলি সখীদলে,
ছিটেমাত্র পানে তৃপ্তি হেসে মরি গ'লে।
করিতাম ভক্তি পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে,
তাঁহাদের পদধূলি লইতাম শিরে।
আশীর্ব্বাদ করিতেন তাঁহারা সকলে,
'মহাদেব স্বামী তব হবে মহীতলে।
চিরসুখী হবে তুমি ভাগ্যবতী নারী,
সুলক্ষণা মূর্ত্তি দেখে চিনিতে যে পারি।'
একমনে বাল্য ব্রত করিতাম যবে,
মহাদেব স্বামী আমি পাই যেন ভবে।
পুকুরে মাছের গাঁদি লাগিয়া কিনারে,
লোক সব জড় হত তার চারি ধারে।
সরোবরতীরে গিয়া ধরি ছোট মাছ,
যাই নাক বেশী জলে থাকি তীর কাছ।
হাত চাপি ধরিবারে যাই আশা করে,
পিছলিয়া যায় মাছ জলের ভিতরে।
কভু করিতাম যাত্রা সকলে সাজিয়া,
মাতিতাম নৃত্যগীতে দ্বারে খিল দিয়া।
প্রাতে উঠি বেড়াতাম মিলে সখীদলে,
বেড়াতাম বাগানে তুলিতে ফুল ফলে।
লুকোচুরি খেলা করি মিলিয়া সকলে,
ছুটাছুটি করিতাম বুড়ী ছোঁব বলে।
আঁখি হলে হার হোত বড় দুঃখ মনে,
বুড়ি ছুঁলে জিত হত আনন্দ বদনে।
চড়িভাত করিতাম রাঁধিতে জানি না,
মনেতে হইত কত রাঁধিতে বাসনা।"

এই পদ্যগুলি জগন্মোহিনীর অন্তরের অকপট সরলভাব, আমোদপ্রিয়তা এবং হিন্দুবালিকোচিত ব্রতনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক। জগন্মোহিনী দেবী বাল্য-কালে সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগ পান নাই। তাঁহার স্বামী প্রথম বয়স হইতেই যেমন ধর্ম্মানুরাগী, সেইরূপ স্ত্রী-শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। দেশহিতকর সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পত্নীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে যে ভারত-মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে পত্নীকে ছাত্রীরূপে প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং স্বতঃপরতঃ তাঁহার বিদ্যোন্নতির সহায়তা করেন। পত্নী অল্প বয়সে অনেকগুলি সন্তানের জননী এবং গৃহ-কার্য্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পতির বা আপনার বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে

পারেন নাই, এজন্য তিনি সততই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তথাপি তিনি সুন্দর চিটী পত্র লিখিতে এবং গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরিচারিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "প্রেম কুসুম" নামে তাঁহার রচিত একখানি কবিতা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। পতিও তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা লইয়া "স্ত্রীর প্রতি পতির উপদেশ" নামক একখানি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ১২৭৭ সালে যখন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন, তখন অনেকগুলি ইংরাজ রমণীর সহিত তাঁহার পত্নীর পত্রালাপ চলিয়াছিল। কুমারী সার্প, কুমারী কলেট, বিবী হিক্‌সন ও স্পিয়ার্স প্রভৃতি তাঁহাকে যে সকল পত্র লেখেন, তৎকালে বামাবোধিনীতে তাহা প্রকাশিত হয়। পাঠিকাগণের কৌতূহল বিনোদনার্থ তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

জগন্মোহিনী কুমারী সার্পকে যে পত্র লেখেন, তাহার উত্তরে উক্ত ইংরেজ মহিলা লেখেন :—

"ফলতঃ আপনার পত্র যে আমাকে কি পরিমাণে আহ্লাদিত করিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। পৃথিবীস্থ সকল জাতির নরনারী যে নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার সহিত যে সকলেরই এক সাধারণ সম্বন্ধ আছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রকাশের নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই যে সেই একই প্রকার হৃদয় আছে ও বাহ্য বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও সেই একই প্রকার আত্মা যে সকলের রহিয়াছে, আপনার পত্র পাঠ করিয়া এই সত্যগুলি আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। উহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের বিষয় চিন্তা করিতে আমার হৃদয় এত প্রশস্ত ও গাঢ়ভাবযুক্ত হইল। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে এক বার আমার বড় ইচ্ছা হয়, কিন্তু উহা বহু দূরে স্থিত এবং ইংলণ্ডে আমি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত, তজ্জন্য কখন যে আমি যাইতে পারিব এমন বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভারতবর্ষীয় ভগ্নীদিগের নিমিত্ত এক এক সময় আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তাঁহাদের জন্য কোন কার্য্য করিতে বড় ইচ্ছা হয়। আপনার পত্রের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিয়াছি। আপনি বিদ্যার অভাব জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনার কন্যাদিগের যাহাতে উত্তম শিক্ষা লাভ হয়, আপনি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি! আমি অনুরোধ করি আপনি একপ নিরাশ হইবেন না। কারণ আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার এরূপ বোধ হইল না যে, যাহাকে আমরা অশিক্ষিত বলি, উহা এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য অনুভব ও দোষ গুণ আলোচনা করিবার আপনার শক্তি আছে এবং আপনার অনেক সৎ ও গম্ভীর চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ আপনি যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আরো জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ইংলণ্ডে যখন কোন রমণী বিবাহিত হইয়া সন্তানের মাতা হয়েন, তখন তাঁহার পক্ষে যাহাতে সেই সন্তানগণের নম্রতা, বাধ্যতা ও ভালবাসা শিক্ষা হয় এবং সৎ বিষয় সকল শিখিবার জন্য তাহাদের প্রবল প্রবৃত্তি জন্মে, সেইরূপে তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য। কারণ স্নেহময়ী জননীরাই সন্তান পালন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্রী। প্রকৃত

নম্রতা, সাবধানতা এবং প্রীতি যে কিরূপ তাহা তাঁহারাই উপদেশ, এবং বিশেষতঃ আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। অতএব আপনি যখন সেই মহাব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন, তখন এই অবনীমধ্যে কে বলিতে পারে যে, আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতেছেন না? সন্তান প্রতিপালনের গুরু কার্য্যভার যখন আপনি বহন করিতেছেন, তখন অপর কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যে আপনার আর অল্পই অবকাশ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্তান প্রতিপালন করা যে কিরূপ মহৎকার্য্য তাহা এক-বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। জননীর জীবনের দৃষ্টান্ত সন্তানের মনে এমন প্রবলরূপে কার্য্যকারী হয় যে, আমরা ইংলণ্ডে এরূপ বলিয়া থাকি, যে ব্যক্তি মহৎ ও সদ্গুণবিশিষ্ট, তাহার মাতা নিশ্চয়ই সেইরূপ কোন অসামান্য গুণবতী হইবেন। আপনার সন্তানেরা এখন শিশু রহিয়াছে, তাহারাই আবার ভবিষ্যৎ বংশের স্ত্রী ও পুরুষ হইবে এবং উহাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত আবার অন্যের জীবনের উপর প্রভাব প্রকাশ করিতে থাকিবে।"

ভারতহিতৈষিণী বিদুষী মিস কলেট লেখেন :—

"তুমি যদি এতদূরে না থাকিতে, আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতাম। তাহা হইলে কত আনন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতাম। তোমার অন্তঃপুরস্থ জীবন কিরূপ জানিতাম এবং তোমার সন্তানদিগের আকৃতি প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতাম, কিন্তু আমি গতিশক্তি-হীন, দুর্ব্বল ও দুঃখিনী এবং লেখনী চালনা ব্যতীত আর কোনও কার্য্য করিতে পারি না। অতএব আমি গৃহে বসিয়া ও লিখিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব। ভারতের, বিশেষতঃ তত্রত্য অবলাকুলের কোন প্রকারে উপকার করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র। আমি যদি তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়ে কোন সাহায্য করিতে পারি, অত্যন্ত সুখী হইব। ভারতীয় নারীগণকে প্রতিদিন অনেক প্রকার আত্মবঞ্চনা ও নিরুৎসাহজনিত কষ্ট পাইতে হয় আমি জানি, কিন্তু হে ভগিনি, ঈশ্বর তোমাকে এ প্রকার স্বামী দিয়া অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে চিরকাল পরম পিতার সাহায্য ও স্নেহলাভে নিশ্চয় আশান্বিত হইবে। * * কুমারী সার্পকে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। তাহা পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। আমি ত্বরায় বাঙ্গালা শিখিতে পারিব, আশা করিতেছি, তাহা হইলে তোমাকে তোমাদের ভাষাতেই পত্র লিখিতে পারিব। কুমারী এস্, ডি, কলেট।"

"আমার প্রিয় ভগ্নি,

আপনার স্বামীর ন্যায় উদারচেতা, সহৃদয় এবং সাধু লোকের সহিত আলাপ হওয়ায় আমি যে কত আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি এবং তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া আমি যে কিরূপ দুঃখিত হইতেছি তাহা বলিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিতেছি। তাঁহাকে পুনরায় আপনি দেখিতে পাইবেন এই চিন্তাটী আপনার কত আনন্দজনক হইবে এবং তিনি ইংরাজদিগের হৃদয়ের যেরূপ প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি কেমন উল্লসিত হইবেন! আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, তিনি আমার যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রতিক্রিয়া আমি কখনও করিতে পারিব না। * * আমি আশা করি, আপনি এই পাশ্চাত্য ও অনুরক্ত ভগ্নীকে সময় সময় মনে করিবেন।

আপনারই

মে, হিক্‌সন্।"

"আমরা কেশব বাবুর গমনে সম্পূর্ণ বিষণ্ন হইয়াছি। কারণ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। আমার ভগ্নী এবং বন্ধুরা

তাঁহার কথা বলিবার সময় চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন এবং আমার স্বামী যখন তাঁহাকে বিদায় দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ সজল দেখিলাম। * * * আমরা ভরসা করি এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহাকে এবং আপনাকে স্মরণপথে রাখিব, নিয়ত পত্র লিখিব এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি এখানে যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিলে আপনি মহা আনন্দিত হইবেন। রবিবার দিবস মিষ্টার স্পিয়ার্স তাঁহার জন্ম উপাসনালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আপনারই

ই, স্পিয়ার্স।"

জগন্মোহিনী অতি স্বাধীনপ্রকৃতি ও অভিমানিনী ছিলেন। তাঁহার মত স্বামি-ভাগ্য কয়জন রমণীর হয়? কিন্তু স্বামী যেমন এক দিকে তেজস্বী, সম্পূর্ণ আপনার মতে স্ত্রীকে আনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; স্ত্রীও সেইরূপ তেজস্বিনী, আপনার সংস্কার ও রুচি অনুসারে চলিতে দৃঢ়ব্রতা। এই জন্য প্রথম অবস্থায় সময় সময় স্বামী ও স্ত্রীর মত ও রুচির সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত। স্বামী সাধারণ হিতকার্য্যে রত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ভর্ত্তার ন্যায় স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও সাংসারিক সুখ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেন না, ইহাতে ভার্য্যার সময় সময় দুঃখ ও অভিমানও হইত। তিনি মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির প্রতি ঔদাস্য করেন। কিন্তু তিনি প্রেমিকা ও ভাবময়ী বলিয়া তাঁহার অভিমান স্থায়ী হইত না এবং স্বামী তাঁহার আন্তরিক ভাব ও সদ্‌গুণ সকলে বশীভূত হইয়া স্ত্রীপ্রকৃতির মধুরতাই অনুভব করিতেন এবং তাঁহার প্রতি আপনার কর্ত্তব্য সাধনে অধিক মনোযোগী হইতেন। আপনার স্ত্রী হইতেই স্ত্রীজাতির প্রতি কেশব বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং তিনি আজীবন স্ত্রীপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের মাতৃ-প্রকৃতি বলিয়া তাহার স্বাধীনতার সম্মান করিয়া গিয়াছেন।

জগন্মোহিনী প্রাচীন সংস্কারে দীক্ষিত ও স্বাধীনপ্রকৃতি হইলেও স্বামীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধিনী ছিলেন না, তাই তাঁহার গুণবান্ স্বামী আপনার ইচ্ছামতে জীবনপথে চলিতে পারিয়াছেন এবং উৎসাহ সহকারে দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য যাহা সৎ বলিয়া বুঝিতেন, তাহাতে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যখন অল্পবয়স্কা বালিকা, তখন স্বামী মাঘোৎসবে সস্ত্রীক ব্রাহ্ম-সমাজে যাইবেন বলিয়া বাটীর কর্ত্তৃপক্ষের অমতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন, স্ত্রী গৃহ ধন জন পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মীয়দিগের তাড়না গঞ্জনা সকল অগ্রাহ্য করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। সে গৃহের দ্বার তাঁহাদিগের প্রতি রুদ্ধ হইল, রমণী স্বামীর সহিত পরগৃহকে আপনার গৃহের মত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বিধবা-বিবাহে

অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সমাজসংস্কার প্রথম প্রথম স্ত্রীর অভিমত ছিল না, কিন্তু স্বামীর উদার ভাব তিনি ক্রমে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে নানা শ্রেণীর নানা বর্ণের ও নানা প্রকৃতির পরিবার সকল এক পরিবার হইয়া বাস করিতে লাগিল, তিনিও সেই পরিবারভুক্ত হইয়া স্বামীর মহোদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা ও সদ্ভাবে অপর রমণীগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি যদিও কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ এবং চিরকাল অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন, তথাপি সময় সময় অবরোধপ্রথা অগ্রাহ্য করিতেও সাহসী হইয়াছিলেন।

জগন্মোহিনী অতি ধৈর্য্যশীলা ও স্থির-প্রকৃতি ছিলেন। "সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ"—সুখ উপস্থিত হইলে তাহার সেবা করিবেক, দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক, তাঁহার জীবনে এ কথার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাণীর জননী হইয়া কোন্ সুখ সম্পদ্ তিনি ভোগ করেন নাই? মাতৃভক্তা কন্যা আপনি যেরূপ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যেরূপ অবস্থায় থাকিতেন, মাতাকেও সেইরূপ অবস্থায় রাখিতে ত্রুটি করিতেন না। পতি বিদ্যমানে জগন্মোহিনী যথার্থ রাজপত্নীর ন্যায় সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু যে দিন হইতে পতিধন হারাইলেন, সেই দিন হইতে বৈরাগিণীর জীবন সচ্ছন্দচিত্তে অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে মহিলা পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"আচার্য্যদেবের সঙ্গে আচার্য্যপত্নী ক্রমে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রাত্যহিক উপাসনায় তিনি নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন। শেষ জীবনে আচার্য্যদেব তাঁহাকে বিশেষরূপে ধর্ম্ম-পথের সঙ্গিনী করিয়া লন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আচার্য্য কয়েক দিন যুগল ব্রত সাধন—যোগসাধন করিয়াছিলেন, অনেক সময়ে বিশেষ ব্রত বিধি সাধনে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। তিনি নিস্তব্ধ রজনীতে ছাদের উপর নির্জনে বসিয়া একতন্ত্রিযোগে সঙ্গীত ও যোগ-ধ্যানে রত থাকিতেন। সেই সময় তিনি বিশেষ বিশেষ প্রচারক বন্ধুকে নিকটে ডাকিয়া সদ্গ্রন্থ শ্রবণ ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। সাংসারিক আমোদ আহ্লাদে তাঁহার স্পৃহামাত্র ছিল না, তখন সৎপ্রসঙ্গে ও উপাসনাদি যোগে ব্রাহ্মিকাদিগের সেবা করার স্পৃহা তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। * * আর্য্যনারী সমাজের উপাসনাদি কার্য্য আচার্য্যপত্নীই চালাইতেন। মাঘোৎসবের সময় আর্য্যনারী সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য তিনিই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনায় আচার্য্যের প্রার্থনা

পাঠের পর প্রায়ই তিনি প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইত। সেই প্রার্থনা শুনিয়া প্রায় সকলে মনে বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন। মহিলাদের মন তাঁহার মধুর উপাসনা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িত। আচার্য্যের অনেকগুলি প্রার্থনা তাঁহা কর্ত্তৃক পদ্যে পরিণত হইয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।"

জগন্মোহিনীর মন অতি উচ্চ এবং হৃদয় অতি উদার ছিল। তিনি কোনও ধর্ম্মের লোককে ঘৃণা করিতেন না—এমন কি নববিধানবাদীদিগের অনেকে যে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়াছিলেন। সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মগণের মুখে ভগবৎ-নাম কীর্ত্তন তিনি অনেক সময় আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন এবং ইহাঁদের নগর-সংকীর্ত্তনের দল তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া যায় এজন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার এরূপ উদার প্রেম ও সৌজন্যে ঘোর বিপক্ষেরাও মুগ্ধ হইয়াছেন।

দেবী জগন্মোহিনী যেদিন পতিধনকে হারাইয়াছিলেন, "হায়! এমন গুণের স্বামীকে হারাইলাম" তাঁহার সেই দিনকার এই কাতর আর্ত্তনাদ আজিও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। আজি তিনি নিত্যধামে সেই হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তুকে পাইয়া কতই না আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেছেন। জগৎ-চিন্তামণি নাম করিতে করিতে তিনি ইহজীবন পরিহার করিয়াছেন, এখন সেই চিন্তামণিকে লইয়া তাঁহার জীবন অনন্তকাল সুখ শান্তি কল্যাণ ও উন্নতি লাভ করিতে থাকুক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

আর্কিমিডিস ও তাঁহার মৃত্যু।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধকালে সিসিলি দ্বীপে যখন রোমক ও কার্থেজীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর সমর চলিতেছিল, তখন সিসিলির গ্রীকগণ কার্থেজীয়দিগের পক্ষ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ আর্কিমিডস ইহাদের মধ্যে একজন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক কৌশলে রোমীয়দিগের জয়-চেষ্টা অনেকবার ব্যর্থ করিয়া দেন। এক সময় তিনি আতসী পাথরের আগুনে দূরস্থ রোমীয় জাহাজ সকল ভস্মসাৎ করেন। রোমক সৈন্যগণ সিরাকুজ নগর অধিকার করিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এই সময় আর্কি-মিডিস ঐ নগরে আপনার গৃহে বসিয়া গণিত অনুশীলনে এত গভীররূপে নিমগ্ন ছিলেন যে, নগরময় যে বিপ্লব, চিৎকার ও ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতেছিল, তাহার কিছুই তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই এবং

তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এক ভীষণমূর্ত্তি সৈনিক পুরুষ যে গৃহে তিনি অঙ্ক কসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং এক শাণিত তরবারি তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ধারণ করিল। কথিত আছে, তিনি তখন জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞাপূরণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন; সৈনিককে বলিলেন "বন্ধো! এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমার প্রমাণ শেষ হইয়া আসিয়াছে।" কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ সৈনিক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখনই তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিল, তাঁহার সে গণনা ইহ জীবনে আর পূর্ণ হইল না। রোমক সেনাপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিলেন এবং সেই গুণবান্ ব্যক্তির দেহ যত্ন সহকারে সমাধিস্থ করিলেন। উত্তরকালে সমাধির উপর একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। বাগ্মী সিসিরো তীর্থস্থান বলিয়া এই স্থান দর্শন করিতে যান, কিন্তু তাহা আগাছা ও কণ্টকে আবৃত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

আর্কিমিডিস সিসিলির অন্তর্গত সিরাকুজ নগরে খ্রীষ্টের জন্মের ২৮৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১২ খৃষ্টাব্দে হত হন। সিরাকুজের রাজা হায়রো তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও সহায় ছিলেন। এক সময় রাজা এক স্বর্ণকারকে অনেক টাকা দিয়া আপনার জন্য এক স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করিতে দেন। স্বর্ণকার তাহা প্রস্তুত করিয়া রাজার নিকট আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিয়া রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, ইহার মধ্যে রৌপ্য মিশান আছে। তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আর্কিমিডিসকে কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য নিরূপণ করিতে বলিলেন। পণ্ডিতবর দিবানিশি এই বিষয় চিন্তা করেন, কিন্তু সমস্যা পূরণের কোনও উপায় স্থির করিতে পারেন না। একদিন প্রকাণ্ড স্নানাগারে স্নান করিতে গিয়াছেন। টব জলে পরিপূর্ণ আছে। যেমন তিনি তাহাতে নামিয়াছেন, টব উছলাইয়া জল পড়িয়া গেল। তাঁহার দিব্যজ্ঞানে তখনই এক আশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কৃত হইল—তাঁহার দেহ-পরিমিত জল টব হইতে বাহিরে পড়িয়াছে, এই জল পরিমাণ করিতে পারিলে দেহের ভার পরিমাণ করিতে পারা যাইবে,—এইরূপে প্রত্যেক বস্তু জলে ডুবাইয়া পরিমাণ করিলে তাহার প্রকৃত ওজন এবং জলমগ্ন অবস্থার ওজনের প্রভেদ বুঝা যাইবে। তবেই ত সমস্যা পূরণ হইয়াছে, সোণার প্রকৃত ওজন ও জলমগ্ন অবস্থার ওজন কখনও সমান হইবে না। সোণার মুকুট আর মিশ্র ধাতুর মুকুট এইরূপে ধরা পড়িবে। এই সকল চিন্তা বিদ্যুতের মত তাঁহার মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে মহানন্দে উন্মত্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যেমন উলঙ্গপ্রায় হইয়া স্নান করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় টব হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাজপথে গেলেন এবং

মনের উচ্ছ্বাসে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইউরিকা, ইউরিকা"—আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি। লোকে এই মহাপণ্ডিতের স্বভাব জানিত, এইজন্য পাগল বলিয়া তাঁহাকে ধরিল না। তিনি উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে গিয়া ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, রাজার সন্দেহ অমূলক নহে। পরে রাজা যে পরিমাণ সোণা দিয়াছিলেন, জলমধ্যে তাহার ওজন এবং এই ভাঁজাল স্বর্ণমুকুটের ওজন করিয়া যে অনেক পার্থক্য হয়, তাহা রাজাকে দেখাইয়া দিলেন। রাজা স্বর্ণকারকে ডাকাইলে সে আপনার অপরাধ স্বীকার করিল এবং দয়া প্রার্থনা করিয়া রাজার পদতলে পড়িল।

আর্কিমিডিসের এই পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহাতত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহা এই যে "কোন বস্তু দ্রব পদার্থের মধ্যে মগ্ন করিলে তাহার কতক ভার কমিয়া যায়, আর ঐ বস্তু যত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেই স্থান-পরিমিত ঐ দ্রব বস্তুর ওজন এই হৃত (কমতি) ভারের সমান।"*

* That a body plunged in a fluid loses as much of its weight as is equal to the weight of an equal volume of the fluid.

জীবনের দশ নিয়ম।*

১। আজি যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না।

২। যাহা নিজে করিতে পার, তাহার জন্য অন্যকে খাটাইয়া ক্লেশ দিও না।

৩। টাকা হাতে না আসিতে তাহা ব্যয় করিও না।

৪। যে বস্তুর প্রয়োজন নাই, সস্তা বলিয়া তাহা কিনিও না, কিনিলে তোমার পক্ষে ইহা মহার্ঘ হইবে।

৫। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতে আমাদিগকে যত ক্লেশ দেয়, অহঙ্কার তদপেক্ষা অধিক।

৬। কম আহার করিলাম বলিয়া কখনও অনুতাপ করিতে হয় না।

৭। যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করি, তাহা কখনও কষ্টকর হয় না।

৮। যে সকল বিপদ ঘটে নাই, তাহার ভাবনায় আমরা কত ক্লেশ পাইয়াছি!

৯। কোনও বস্তু ধরিবার সময় তাহার যে দিক্ মসৃণ তাহা ধর।

১০। রাগ হইলে পুনরায় কথা কহিবার পূর্ব্বে দশ গণনা কর; যদি বেশী রাগ হইয়া থাকে, ১০০ গণনা কর।

* আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বহুদর্শী জাফার্সনের এই উপদেশগুলি "জাফার্সনের দশ নিয়ম" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হেঁয়ালী।

আমরা অনেক দিন আর হেঁয়ালীর উত্তর পাই নাই বলিয়া নূতন হেঁয়ালী প্রকটনে ক্ষান্ত ছিলাম। বৎসরের শেষে আর কয়েকটী প্রকটন করিয়া এ বৎসরের মত আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিব।

আশ্বিনের হেঁয়ালীর উত্তর।

(১) বাদাম। (২) নাসিকা। (৩) ভ(অক্ষর)। (৪) কেরাণী। (৫) পাতাল।

ফাল্গুনের হেঁয়ালী।

বিবাহ হাতীর সঙ্গে একি বিড়ম্বনা,
না পারি বহিতে ভার আপনি আপনা। ১
আদি দুই বর্ণে যন্ত্র পাক করিবার,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বাসনা অপার,
ছাড়িলে প্রথম বর্ণ পীড়া গুরুতর,
কে আমি ভূতের মধ্যে বসি নিরন্তর ? ২
চিনদেশ হতে আসি পড়িলাম বাঁধা
লতাপাশে; চাল উড়ে গেল একি ধাঁধাঁ—
ডিম ফুটাইতে পাখী আসি দেখা দিল,
অম্বরস-ভয়ে মোরে দেখে পলাইল। ৩
গলায় পা দিয়া মোরে বানাল বাতুল,
বুদ্ধিশুদ্ধি যাহা ছিল সব হলো ভুল। ৪
প্রথম দ্বিবর্ণে আমি সন্ন্যাসীর জায়া,
দ্বিতীয় দ্বিবর্ণে একেশ্বর শতকায়া,
এক বর্ণে মাতৃসম পালি জীবগণ,
তিন বর্ণে মাতৃক্রোড়ে যাছু বাছাধন। ৫

নূতন সংবাদ।

১। ছোটলাট সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জী পীড়াবশতঃ পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন।

২। কলিকাতায় গ্যাসের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক আলোক দিবার ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৩। মড়ক উপলক্ষে বোম্বাই নগরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া কয়েকটী ইউরোপীয় ও অনেকগুলি দেশীয় হতাহত হইয়াছে।

৪। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার রাজত্ব-কালে ২৮৫ জনকে লর্ড করিয়াছেন।

৫। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্ষুর পীড়া বশতঃ হাইকোর্টের প্রধান গবর্ণমেণ্ট উকিলের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৬। বিশ্বহিতৈষী জর্জ মূলারের বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার অনাথাশ্রম

সকলের অধিবাসিসংখ্যা ১৭০০। তাঁহার কার্য্যের সাহায্যকারীর সংখ্যা ২০০।

৭। আমাদের বড় লাট লর্ড এল্‌গিনের জননীর ৮০ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। জগদীশ্বর ইহাঁর শোকের সান্ত্বনা করুন্।

৮। গত ১৪ই ফাল্গুন যোধপুরের যুবরাজ পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

৯। পারিসে নূতন দুইখানি দৈনিক পত্র স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

১০। দিল্লীতে উর্দ্দু ভাষায় একখানি পত্রিকা বাহির হইবে, একজন উচ্চবংশীয় মহিলা ইহার সম্পাদনের ভার লইয়াছেন।

১১। রুষীয় রাজকোষের আয় ১৪ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। আর কোন রাজ্যের রাজস্ব ইহার সমতুল্য নহে।

১২। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের নৈহাটী হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত ডবল লাইন হইবে।

১৩। সেলোরা কেসিনা নাম্নী এক মার্কিন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা। চিলি ও পেরু প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ তামার খনি তাঁহারই। তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন কোটী টাকা। সমুদয় সম্পত্তির মূল্য কত, বিবেচনা কর!

১৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিবি পি, হার্ষ্ট বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য এক কোটী টাকার অধিক দান করিয়াছেন।

১৫। রুষীয় সম্রাট সৈন্যগণকে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

১৬। আফ্রিকাতে প্রতিবৎসর হস্তিদন্তের জন্য প্রায় ৬০ হাজার হস্তী নিহত হয়।

১৭। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু মিশর রাজ্যে ইহার বিপরীত। তথায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক।

১৮। এ বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী স্ত্রীলোক বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম কুমারী কমলা রত্যং কৃষ্ণগমা। তিনি এক হিন্দু সব-জজের কন্যা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

কবিরাজি-শিক্ষা—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ সঙ্কলিত। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত এবং অধুনাতন হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসা পুস্তক সকলের রচনা ও বিষয়-সন্নিবেশ প্রণালীর অনুরূপ অভিনব প্রণালীতে লিখিত। ইহা আট খণ্ডে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য অতি বিশদ ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় দক্ষতার সহিত লিখিত। ইহাতে প্রত্যেক রোগাধিকারে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিখ্যাত বিখ্যাত পরীক্ষিত

ঔষধসমূহ, উহাদের সেবন, প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবদেহতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির ডাক্তারী ও কবিরাজী মত স্থানে স্থানে চিত্র দ্বারা বিশদ করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে পূর্ণাবয়ব করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাবলীর উপাদানসমূহের শাস্ত্রীয় নাম, দেশী চলিত নাম, লাটিন ভাষায় নাম ও গুণাদির তালিকা দিয়া গ্রন্থের উপকারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাপ্রণালী-শিক্ষার্থীদিগের এবং সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপযোগী ও আদরের বস্তু হইবে। পুস্তকখানির আয়তন হিসাবে ইহার মূল্য সুলভ করা হইয়াছে বলিতে হইবে এবং নগেন্দ্র বাবু বিস্তর গবেষণা ও বহু পরিশ্রম করিয়া অভিনব প্রণালীতে রচিত এই সুবৃহৎ চিকিৎসাগ্রন্থখানি অতি সুলভ মূল্যে প্রচার করিয়া সহজে কবিরাজিশিক্ষার পথ প্রসারিত করিয়াছেন। এজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইতিমধ্যে গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে, ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আশা করি উৎসাহী গ্রন্থকার মহাশয় ইহার ষষ্ঠ সংস্করণে মুষ্টিযোগ অধ্যায় বিস্তৃত করিয়া এবং দ্রব্যগুণাদির এক নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে ত্রুটি করিবেন না। এই স্বাস্থ্যহীন দেশে এইরূপ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপাদেয় গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সকল গৃহে রক্ষা করা এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত।

বামারচনা।

অনন্ত বিষাদ।

(দেবী জগন্মোহিনীর বিয়োগে)

একি শুনি অকস্মাৎ, কঠিন কুলিশপাত
আমাদের ভগ্নপ্রাণ দুঃখী পরিবারে,
কমল-কুটীর হতে, শত যোজনের পথে
বিষাদে ব্যথিত সবে শোক-সমাচারে।
ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ, সবে বিষাদিত মন,
সকলের মুখে আজি বিষাদের রেখা;
জননীর সম যিনি, আমাদের শিরোমণি,
আর তাঁরে এ সংসারে নাহি যাবে দেখা।
সে দিন কেশব তরে, সবে মোরা ঘরে ঘরে
কেঁদেছি কাতর প্রাণে বিষাদে বিরলে,
কোন্ অপরাধে আজ, বজ্রের উপরে বাজ
পড়িল, কাঁদাতে সবে তীব্র অশ্রুজলে?

মিলে ভাই ভগ্নী সবে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে ক্ষুণ্ণভাবে
চল যাই দেখি আজ জননী-শ্মশান,
শোকপূর্ণ অশ্রুজলে, জননী সমাধিস্থলে
চল সবে, অশ্রুজলে ভাসাই সে স্থান।
প্রাণভরে ডাকি তাঁরে, স্মরিলে অন্তরে যাঁরে
হৃদয়ের দুঃখরাশি হয় নিবারণ,
যাঁহার আদেশক্রমে, পবিত্র স্বরগভূমে
গেছেন জননী ত্যজি সংসার-গহন।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।

বিদায়।

১

বিষাদের দিন, হায়! সদাই যে পড়ে মনে,
মনোব্যথা, অশ্রুজল প্রবাহে তাহার সনে,
নিশিদিন সেই ছবি, জাগিছে হৃদয়-মাঝে,
মরণের নাহি সাধ্য মুছাতে হৃদয়রাজে
নবীন এ প্রেম-স্মৃতি হ'তে।

২

নিকটে প্রেমের ছায়া, নেহারি নিকটতর,
দীর্ঘ অদর্শনে, প্রেম, ধরে রূপ মনোহর,
ভাষা মরে, স্মৃতি জাগে, মরণ-ভীষণ-শরে
উর্দ্ধশির, পড়ে লুটাইয়া, যাতনার ভরে
সুশীতল বিভু-পদ-প্রান্তে।

৩

হে মাতঃ বসুধে! তব অভাগিনী তনয়ার
কেহ নাহি এ জগতে আপনার বলিবার;
সুকোমল ক্রোড়ে তব, লভিব বিরাম সুখে;
ব্যথা পেলে, শ্রান্ত হলে, লুকাব মা তোরি
বুকে—
তুই মোর জীবন-আধার।

৪

শূন্য গৃহ, শূন্য হৃদি, জগত এ মরুময়,
একের অভাবে সব 'শূন্য শূন্য' নিরথয়,
দয়াময়! বিধান তোমার, বুঝে সাধ্য কার,
তুমি বিনা কে বা পারে, লাঘবিতে হৃদি-
ভার,
তুমি মাত্র ভরসা আমার।

৫

নীবব বসুধা যবে, রজনীর স্তব্ধ বুকে,
নিরমল শিশুপ্রায়, ঘুমায় মনের সুখে,
স্বপনেরা, ক্ষণেকের তরে, শ্রান্ত আঁখিতলে
কি মধুর ছবি আঁকে, ভুলায় কতই ছলে,
তৃষিত এ তাপিত পরাণ।

৬

আধেক ঘুমের ঘোরে, আধেক স্বপনে
ভুলি,
ফিরে পাই আগেকার সুখের সে দিনগুলি।
পিপাসু প্রেমের দৃষ্টি শুনিবারে সে মধুর
ভাষা,
আকুলিত প্রাণে মোর, জাগায় নূতন আশা,
অতীতেরে ভাবি বর্ত্তমান।

৭

প্রেম-ডোরে বাঁধা, সে যে দূরে যাইবার নয়,
অন্তরের নিধি মোর, অন্তরে লুকান রয়;
আমি যদি দূর ভাবি, তবেই সে দূরে যায়,
নয়নে অদৃশ্য,—কিন্তু, অন্তর দর্শন-পায়,
প্রেম-বক্ষে অমর আত্মার।

৮

বর্ষ দুই হ'ল, সেই তনু লয়েছে বিদায়,
প্রেমের কলিকা তিন, রেখে গেছে এ ধরায়.
কালেতে তাহারা যেন, গোলাপ কুসুম সম,
বিতরে সৌরভ, বিকাশি লাবণ্য অনুপম,
ঘুচায় সকল হৃদি-ভার।

৯

শূন্য হৃদি?—না, না, সে যে পূর্ণ এবে পরব্রহ্ম জ্ঞানে,
ভবের অসার সুখে মন শান্তি নাহি মানে।
তরুবর গেছে দেব-লোকে, দিব্য রূপ ধরি,
ফেলে গেছে ছিন্ন লতিকারে, ধূলায় ধূসরি
জড়াইতে ব্রহ্মতরু-শাখে।

১০

ভুলিয়া অসার কথা, সাধু-অমরাত্মা সনে
থাকি যেন মগ্ন সদা পরব্রহ্ম-যোগ ধ্যানে;
পথ বলে দিয়ে গেছ, কিসের ভাবনা তবে?
ঠিক্ পথে চলি যদি, মিলন হবেই হবে—
সাধ্য কার, মোরে দূরে রাখে?

শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত, চুঁচড়া।

সরোজিনীর খুকী।

(জন্ম ৭ই মাঘ—মৃত্যু, ৩০এ মাঘ, ১৩০২)

১

কেন বিধি এমন পাষাণ?
মানব মানবীগণে কেন দহে হুতাশনে
করুণা-মমতা-হীন দেবতার প্রাণ!
আশায় নিরাশা-মাখা স্নেহ হুতাশে ঢাকা,
আনন্দে বিষাদ মেলা,—বিচিত্র বিধান!
এমন কঠিন কেন দেবতার প্রাণ?

২

অস্ফুটন্ত সে কলিকা, (শরতের সেফালিকা)
ভাল করে সোনামুখে না ফুটিতে হাসি,
কেন রে পড়িল ঝরি? কেরে রাহু বেশ ধরি
প্রতিপদে এ চন্দ্রমা ফেলিল গরাসি?

৩

কত সাধ, কত আশা ছিল মোর মনে;
একটী পলকে হায়! শেষ হ'ল সমুদায়.
একটী নিঃশ্বাস ভেদ জীবনে মরণে!
এই ছিল ইহলোকে, এই কাঁদাইয়া শোকে
চলে গেল পরলোকে বুঝি না কেমনে!
জীবনে মরণে খেলা প্রভাত সায়াহ্ন বেলা
সময়াসময় নাই,—দয়া নাই মনে।

৪

যখন প্রথম মেয়ে দেখিল ভূতল,
নিরানন্দ সমুদয়, কত ভবিষ্যৎ ভয়,
কত যেন হুতাশ্বাস, কত অশ্রুজল,
কত ঘৃণা, কত ছি ছি করে সবে মিছামিছি
একটু আহ্লাদ নাই,—বিষাদ কেবল!
দেখিয়া সোণার খুকী কেহই হলনা সুখী,
সবাই ভাবিল মেয়ে মহা অমঙ্গল!
তাতেই চরণে ঠেলি গেল সে সকলে ফেলি,
দারুণ মানিনী মেয়ে,—জলন্ত অনল!

সবারি ঘুচিল ভার, চিন্তা দূর সবাকার,
মায়ের পরাণভরা শ্মশান কেবল!
তারি শুধু সর্ব্বনাশ, তারি শুধু হতাশ্বাস,
আমরণ তারি শুধু নয়নের জল!

৫

কোথা সুরপুর?—
কই সে নন্দনবন, সুশীতল সমীরণ,
কোথা শান্তি-নিকেতন অনন্ত মধুর?
কোথায় অমরাবতী মন্দাকিনী স্রোতস্বতী,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুধামাখা সুর?
হায় সে একাকী মেয়ে কোন্ পথে গেল ধেয়ে?
আহা! সে অজানা দেশ কোথা?—কত দূর?

৬

আর কি হবে না দেখা আহা! তার সনে?
জলন্ত উল্কার মত বেড়াইব অবিরত
খুঁজিয়া সে বালিকায় ভূতলে গগনে!
দীনা কাঙ্গালিনী বেশে বেড়াইব দেশে দেশে,
দেখিব আমার খুকী গেল কোন্ খানে!
তুলিয়া করুণ তান গাইয়া খেদের গান
করিব করুণা ভিক্ষা সবার চরণে,
আমার সোণার মেয়ে দেয় কিনা দেখাইয়ে
কোন্ পথে গিয়াছে সে,—রয়েছে কেমনে।
কার বুকে শুয়ে থাকে, "মা" বলে কাহারে ডাকে,
ঘুচায় পিপাসা তার কার স্তন পানে?

৭

ডাকিয়া নিয়াছে বিধি বালিকা আমার,
সবারি মনের ভয়— দূর হ'ল সমুদয়
তাহার কারণে কারো খেদ নাই আর।
যার মেয়ে সে নিয়াছে সকলেই বাঁচিয়াছে,
খুঁজিতে হবে না "বর" এ জগতে তার।
স্বরগে বিবাহ হবে, দেবদেশে সুখে রবে,
পাইবে স্বর্গের শিক্ষা সুর-অঙ্গনার!
'অনূঢ়া কুমারী মেয়ে কাঁদিবে না বর চেয়ে'
ভাবিয়া হবে না কারো হৃদয় অঙ্গার!
সবারি ভাবনা ভয় দূর হ'ল সমুদয়,
স্বরগের খুকী গেছে স্বরগে আবার!
একটী মাসের তরে এসেছিল এ সংসারে
কেবল বুঝিতে স্নেহ মমতা সবার!
যাক্ মেয়ে দেবদেশে দেব-বালিকার বেশে,
আমিও যাইব ত্বরা নিকটে তাহার—
না হয় না হ'ল ভবে, সেইখানে দেখা হবে,
অবসান হবে সব জ্বালা যন্ত্রণার,
ঘুচিবে জন্মের মত এই হাহাকার।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
ময়মনসিংহ।

শেষ নিবেদন।

এই নিবেদন বিভো! শেষ-নিবেদন,
নেবে যদি ভগবান্,
মম এ অধম প্রাণ,
নেও তারে প্রেম বাহু করি প্রসারণ,
দেখাইয়ে তারে তব মূরতি মোহন।
মরিব তোমারি নামে ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
ছাড়িয়া তোমারি ধরা
যাব সে অমৃত-ভরা,

সেই তব দেব-দেশ—যথা শোকভয়
না করেছে বিচরণ—সদা সুখময়।
এই নিবেদন বিভো শেষ নিবেদন,
যেন হে আমার তরে
কেহ শোক নাহি করে,
ঐহিকের সুখ আর জীবন চাহে না,
লভি মৃত্যু আলিঙ্গন,
সুখে করিব গমন,—
অমৃতে—অমৃতে পূর্ণ সে দেব-সদন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।
এ সংসারে সুখ দুঃখে,
যাঁহারে ধরি এ বক্ষে,
কৃতার্থ মেনেছি, আজ সেই প্রিয়ধন
রাখিবে হে সযতনে,
সে মুখ হেরি নয়নে,
সুখেতে লভিব মম অন্তিম শয়ন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন,
তব নাম স্মরি হরি!
ভব ধাম পরিহরি,
সুখেতে লভিব চির-শান্তি-নিকেতন।
তোমারি অমৃত-বুকে
ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালি সুখে
ঘুমাব অনন্ত কাল অনন্ত জীবন,
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।

শ্রীমতী রেবা রায় কটক।

No. 399. April, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৯ সংখ্যা। | চৈত্র ১৩০৪—এপ্রেল, ১৮৯৮ | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-পরীক্ষক—লক্ষ্ণৌ আড্‌বোকেট বলেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য পরীক্ষায় (এফ এর তুল্য) বিবী জেনিংস পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে ইহা এক নূতন দৃষ্টান্ত, ইহা দ্বারা শুভ-ফলের আশা করা যায়।

জেনানা হাঁসপাতাল—লেডি ডফরিণ জেনানা হাঁসপাতালের জন্ত ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কাসিমবাজারের বাবু আশুতোষ নাথ রায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী(২য় বার) ৮০০০ টাকা, গিধোড়ের মহারাজা ২০০০ টাকা এবং কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ড—গত ২২শে মার্চ টাউনহলে ইহার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক গণ্য মান্য লোক সভাস্থ হন এবং স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করেন। বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত যে এই ফণ্ডের অধীনস্থ হাঁসপাতাল সকলে অধিবাসী রোগীর সংখ্যা ১৮৯৬ সালে প্রায় ৩০ হাজার ছিল, ১৮৯৭ সালে ৩৩ হাজার হইয়াছে এবং বহিরাগত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ স্থানে ১৩৷৷ লক্ষ হইয়াছে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষ অপেক্ষা দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে রোগীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধেয়। এই ফণ্ডের অধীনে এখন ৩৩টী ১ম শ্রেণীর লেডী ডাক্তার, ৭০ জন আসিটাণ্ট সার্জন এবং ২১৭জন হাঁসপাতাল আসিষ্টাণ্ট আছেন। লেডী ডফরিণের পর লেডী ল্যান্সডাউন ও তৎপরে লেডী এলগিন লেডী-প্রেসিডেণ্ট হইয়া ফণ্ডের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

ভারত বিজ্ঞান-সভা—গত ২১শে মার্চ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের স্থাপিত বিজ্ঞানসভায় বার্ষিক অধিবেশনে ছোট লাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী সভাপতিত্ব করেন। তিনি দেশীয়দিগের বিজ্ঞান চর্চ্চার বন্ধু বলিয়া আপনার পরিচয় দেন এবং সভায় ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করেন।

স্ত্রী-সৈন্য—আমেরিকার আট্‌লাণ্টা, জর্জিয়া, ডুবার এবং কলরেডো প্রদেশে কেবল রমণীদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের অধ্যক্ষ ইহাদের শিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া বলিয়াছেন "যে সকল অস্ত্র ইহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার ইহারা করিবে এবং ইহাদের জন্য যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইতেছে, তাহার; সুফল জগৎকে দেখাইবে।" প্রাচীনকাল হইতে বীরাঙ্গনার কীর্ত্তি জগতে বিদিত, সমরকৌশল-শিক্ষিতা নারীদিগের অভাব বর্ত্তমান কালেই বা কেন হইবে? তবে ইহাঁরা জগতের কি মঙ্গল সাধন করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

ফুলে রঙ্গ করা—জলের সহিত এনিলাইন রঙ মিশাইয়া তাহাতে ফুলের বোঁটা ডুবাইলে ফুলে নানা বর্ণ উৎপন্ন হয়। দুই প্রকার রঙ একত্র মিশ্রিত করিলে ফুলে চিত্র বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হয়।

বিলাতে দেশী রন্ধনশালা—পুনার প্রসিদ্ধ সোরাবজীর ভগিনী লঙ্গরাথা লণ্ডন নগরে এক বাবুর্চ্চিখানা খুলিয়া দেশীয় সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জনে ইংরাজ-রসনা বেশ তৃপ্ত করিতেছেন এবং অর্থোপার্জনেরও এক পথ পাইয়াছেন।

মুসলমান বালিকাবিদ্যালয়—গত ২৩শে মার্চ রবিন্‌সন ষ্ট্রীট ১নং ভবনে এই বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চিফ-জষ্টিস-পত্নী লেডী ম্যাক্লিন স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সার জন উডবরন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন। এক বৎসরে ৪৬টী বালিকা ভরতি হইয়াছে এবং মুরসিদাবাদের নবাব বেগমের বদান্যতায় ইহার অর্থাভাব নাই। মুসলমান বালিকাদের জন্য কলিকাতায় এই একমাত্র বিদ্যালয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

দোষের পরীক্ষা।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যেরূপ দৈব উপায়ে দোষীর দোষ সাব্যস্ত হইত, ইউরোপের অন্ধকার-যুগে অনেকটা সেইরূপ হইত। এ বিচার যদিও মনুষ্য-দিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যাজকগণ নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ

ও ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতেন, সেইজন্য ইহাসাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিচার বলিয়া অভিহিত হইতএবং লোকেও তাহাই বিশ্বাস করিত। দোষী বলিয়া যাহার উপর সন্দেহ হইত, বস্ত্রে চক্ষু বন্ধনপূর্ব্বক লাঙ্গলের তপ্ত ফালের উপর তাহাকে দাঁড়াইতে হইত। কখনও আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে হইত। কখনও জ্বলন্ত লৌহদণ্ড হস্তে ধারণ করিতে হইত, কখনও তপ্ত জলের মধ্যে সমুদয় হস্ত ডুবাইয়া ধরিতে হইত। এই সকল অগ্নি-পরীক্ষা। এ দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অগ্নি স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী দেবতা, দোষী তাহার স্পর্শে দগ্ধ হয়, কিন্তু নির্দ্দোষী নিরাপদে অব্যাহতি পায়। ইউরোপের লোকে অগ্নিকে সেরূপ চক্ষুতে না দেখিলেও মন্ত্রপূত অগ্নি দ্বারা দোষ ধরা পড়ে বিশ্বাস করিত। অগ্নি দ্বারা যাহার দেহ ক্ষত হইত সে দোষী, যাহার দেহ অক্ষত থাকিত, সেই নির্দ্দোষী। অগ্নির প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য নানা প্রকার যাদুবিদ্যা এবং মন্ত্র তন্ত্র ও কল কৌশলও অবলম্বিত হইত, তাহা দ্বারা কত দোষীও নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইয়া যাইত।

অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পরীক্ষা ছিল। অভিযোগকারী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিত। বলবান্ লোক দুই পক্ষেরই প্রতিনিধি হইতে পারিত; যুদ্ধে যে পক্ষের জয় হইত, সেই নির্দ্দোষী এবং যে পক্ষের পরাজয় হইত সেই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। মধ্য যুগের ইউরোপীয়েরা ডাইনে বিশ্বাস করিতেন। যে স্ত্রীলোককে ডাইন বলিয়া সন্দেহ হইত তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলে যদি সে ডুবিয়া মরিত, তবে নির্দ্দোষী; যদি সাঁতার দিতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃত ডাইন বলিয়া প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইত। উভয় স্থলেই মৃত্যু ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। ডাইনকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিবার পদ্ধতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

কোনও বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে তাহারও দৈব বিচার হইত। একটী ক্রুসকাষ্ঠ পুতিয়া তাহার সম্মুখে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় বা তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তির ন্যায় বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইতে হইত। যাহার বাহু অগ্রে ভারাক্রান্ত হইয়া অবনত হইত, সেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত এবং মোক-র্দ্দমা হারিত। এক সময়ে এক মঠের স্বত্ব লইয়া পারিসের ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং সেণ্ট ডেনিসের সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিবাদ হয়। বিচারক কোন প্রকারে তাঁহাদের বিবাদের মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্রুসের বিচার অবলম্বন করেন। বাদী প্রতিবাদী আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক ব্যক্তিকে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুই ব্যক্তি ক্রুস-কাষ্ঠে যীশুর ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল। চারি দিকে বহু লোক সমবেত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি

এক পক্ষের—কতকগুলি অন্য পক্ষের জয় কামনা করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান রহিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতিনিধির বাহু অগ্রে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেল, ইহাতেই ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরাজয় হইল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থির ছিল না। পিতার সন্তানেরা অনেক স্থলে পিতার বিষয় সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইত,কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে কোনও সন্তান পুত্রাদি রাখিয়া মরিয়া গেলে এই পুত্রাদির স্বত্ব লইয়া গোলযোগ হইত। এক সময় এইরূপ এক বিবাদ মীমাংসারজন্য এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যবস্থা হইল। পিতৃহীন পৌত্রদিগের পক্ষীয় যোদ্ধা জয় লাভ করিল। সেই সময় হইতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইল যে, পিতৃহীন সন্তানেরা খুড়া জেঠাদিগের সহিত পৈতৃক বিষয়ের সমাধিকারী হইবে। একাদশ শতাব্দীতে দুইটী উপাসনা-পদ্ধতির কোন্‌টী অবলম্বনীয় ইহা লইয়া বিবাদ হয়। তখনি দুই পক্ষের দুই বীর দ্বন্দ্‌যুদ্ধে সুসজ্জিত হইলেন এবং যে পদ্ধতির পক্ষীয় বীর জয়ী হইলেন, তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইল। কোনও ভূমির সীমা লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে জজের আজ্ঞানুসারে সীমানার এক চাপড়া মাটী আদালতে আনা হইত। পরে জজের আদেশে দুই পক্ষ ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্ব স্ব তরবারীর অগ্রভাগ দ্বারা সেই মাটী স্পর্শ করিত। অতঃপর দ্বন্দ্‌যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইত।

চোর ধরিবার অপূর্ব্ব উপায় ছিল। চুরি অপরাধে অপরাধী বলিয়া যাহার উপর সন্দেহ হইত, তাহাকে যাবলীর প্রস্তুত রুটী গিলিয়া ফেলিতে বলা হইত। সে যদি গিলিতে পারিত, তবে নির্দ্দোষী, নতুবা দোষী সপ্রমাণ হইত। রুটির সহিত খানিকটা পণির দিয়া এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। এই রুটী পবিত্র রুটী এবং পণির পবিত্র পণির নামে উক্ত হইত। এই রুটী ও পণিরের উপর সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যবের পাযরুটী বিনা তাড়িতে প্রস্তুত হইত এবং যে দুগ্ধে পণির হইত, তাহা মে মাসে ভেড়ীর স্তন হইতে দোহন করিয়া সংগ্রহ করা হইত। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এইরূপ এক পরীক্ষায় রুটী গিলিতে না পারিয়া সুপ্রসিদ্ধ গডউইনের মৃত্যু হয়। এই প্রথা হইতে "এই রুটী যেন আমার কণ্ঠরোধ করে" ইংরাজীতে ইহা একটী প্রবচনরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সাধনা।

১

কে জানে এ কিসের সাধনা
সাধিতেছি জনম ভরিয়া,
চুম্বক উত্তর-মুখে, চেয়ে থাকে কোন্ সুখে,
সূর্য্যমুখী রহে কেন
তপনে চাহিয়া?

২

দিবা যায় নিশা আসে ফিরে,
আসে যায় মাস তিথি বার ;
বিশ্বে আসে সেই প্রীতি, প্রাণে জাগে সেই স্মৃতি,
আমারি সে দিন শুধু
আসে না আবার !

৩

বসি সেই তরুর শাখায়
বিহগেরা গায় কত গান,
সেইতো সায়াহ্ন-রবি, তেমনি রক্তিম ছবি,
ডুবায় সাগর-তলে
সোণার বয়ান !

৪

তেমনি হাসিয়া আসে শশী,
সাথে শত তারা সহচরী ;
সেই বেলী যুঁই ফোটে, দক্ষিণ-অনিল ছোটে,
বসন্ত উছলে সেই
মোহন মাধুরী !

৫

তেমনি আনন্দরাশি মাখা,
প্রকৃতির সাধের আগার ;
সেই কপোতাক্ষী-কূলে, ঢেউগুলি দুলে দুলে,
মৃদুল-সমীর-ভরে
চুম্বে দুই ধার !

৬

শুধু সেই আসে না মিশিতে,
জগতের আনন্দ শোভায় ;
তারি পানে চেয়ে পাখী, হরষে উঠে না ডাকি,
মলয় বাতাস আজি
লাগে না সে গা'য়।

৭

শুধু সেই আসে না হাসিতে,
মরতে যে "মৃত সঞ্জীবনী"—
তাতেই সকলি শূন্য, সারা বিশ্ব অসম্পূর্ণ,
আলোক, উদ্যমহীন
যেন রে অবনী !

৮

তাই আমি ভাবি মনে মনে,
সে কেন এ অশরীরী প্রায় ?—
কোথায় কেমনে রহে, একটী কথা না কহে,
মনে ভেসে উঠে শুধু
নব জ্যোছনায় ?

৯

এত ডাকি, এত সাধি, তবু
শুনে না সে, এমনি নিদয়,
মহত্ব—দেবত্ব, আর, কত কি যে আছে তার ;
তবে কি বিধাতা তার
গড়েনি হৃদয় ?—

১০

—না না সে হৃদয়-হীন নহে
জানি আমি, খুলিয়া বলিব ;
ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে, মানসে লুকায়ে সেবে,
আমি কেন দেবতারে
বাহিরে দেখিব ?

১১

এ ধরা যে ধূলা মাটী ভরা,
হেথা বহে কলুষ বাতাস,
এখানে অমর মূর্ত্তি, পারে কি পাইতে স্ফূর্ত্তি,
নিত্য হেথা স্বার্থ, দ্বেষ,
বিষাদ, হতাশ !

১২

কে পাষাণ, চাহে ফুটাইতে
মরুদেশে স্বরগ-মন্দার ?
লেগে সে তপত বায়, কুসুম শুকায়ে যায়,
থাকে না পবিত্র ছটা
ত্রিদিব-শোভার !

১৩

তবে,
দেবতা কি প্রাপ্য নয়নের?
তা হ'লে "দেবত্ব" আর কই ?—
মোর সে পরমারাধ্য, ইন্দ্রিয়ার্থে নহে সাধ্য,*
হয় না সে দেব-পূজা
মনে মনে বই !

১৪

এমনি মরত-তলে তারে
পূজি যেন জনমে জনমে ;
যদি সে মানুষ হয়, মর ব্যবহার লয়,
তা হ'লে যে ম'রে,যাব
দারুণ সরমে।

১৫

অকলঙ্ক চন্দ্রমার মত,
বিরাজে সে সুদূর আকাশে,
আমি চকোরের মত, এ ভূতলে অনাহত।—
পোহাই তাহারি আলো
মনের উল্লাসে !

১৬

অপূর্ণ ও অশান্ত মানব,
শুদ্ধ-সত্ত্ব, সম্পূর্ণ দেবতা ;
সেই পদ করি ধ্যান, দুর্ব্বল, চঞ্চল প্রাণ,
দেব-বলে বলী হবে,
নাহিক অন্যথা ;
বিভুর আশীষে তবে, এ তপস্যা পূর্ণ হবে,
মুছি যাবে মরমের
লুকানো হীনতা !
তখন এ ক্ষুদ্র হিয়া, বিশ্বে দিব মিশাইয়া,
পাব অনাসক্তা ভক্তি, পাব পবিত্রতা,
পাব সে নির্ব্বাণ মুক্তি, আর অমরতা।†

বঙ্গমহিলা।

অর্থই অনর্থের মূল।

১

অর্থ স্বর্গ সুধার ন্যায় সঞ্জীবনী শক্তিতে নির্জীব জগতের সজীবতা সম্পাদন করে, অনাথ অনাথার নয়নাশ্রু বিমোচন করিয়া হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত চির-সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করে ; আবার বিষম হলাহল স্রোতে জগৎকে জর্জ্জরিত করে, পরম আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, সোদর সোদরার সস্নেহ মূর্ত্তি বিষময় করিয়া তুলে।

মাধবনগরনিবাসী গৌরীশ-চন্দ্রের পিতা

*সাধ্য—সাধনীয়।

† এই কবিতাটি আমার ব্রহ্মচারিণী ভগিনীদিগের হস্তে প্রীতি উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

লেখিকা।

স্বার্থবুদ্ধি হরিভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি কয়েক বিঘা জমি ও তৈজস পত্রাদি আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় সহোদর জয়হরিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। জয়হরি ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জ্ঞান করিয়া প্রথমে সস্ত্রীক গ্রামস্থ এক ধনীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন; পরে উক্ত ধনী মহোদয়ের অর্থসাহায্যে ও স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে পৈতৃক বাস্তুর এক অংশে সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়া যৎসামান্য বাণিজ্যের উপস্বত্বে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

হরিভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া মনে করিয়াছিল, সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে; কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি বিমুখ, সে অচিরেই পীড়াক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। পৈতৃক সম্পত্তির যে আয় ছিল, তাহাতে সাংসারিক ব্যয় সংকুলান ও পীড়ার চিকিৎসা এতদুভয় হওয়া অসম্ভব, সুতরাং উহা প্রথমে বন্ধক দেওয়া হইল, পরে বিক্রীত হইয়া গেল। তৈজস পত্রাদি যাহা কিছু ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে বিক্রীত হইতে লাগিল। হরিভূষণের কষ্টের অবধি রহিল না। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা স্ত্রী পুত্র সহিত অনশনে দিন কাটিত। জয়হরি ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু হরিভূষণ যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। জয়হরি ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া ভ্রাতার দুর্গতি-হরণার্থ ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত ঔষধ পথ্য না পাওয়াতে হরিভূষণের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। পত্নী ও একমাত্র অপগণ্ড পুত্রকে দুঃখ দারিদ্র্যে নিমগ্ন করিয়া হরিভূষণ ইহলোক ত্যাগ করিল। হরিভূষণপত্নী নিঃস্ব—তাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই, কিন্তু তাহাতেও সে তত দুঃখিত নয়—তাহার ভয়, পাছে স্বীয় দেবরের নিকট নীচতা স্বীকার করিতে হয়, পাছে তাহার অন্ন জল গ্রহণ করিতে হয়। সন্তান সমস্ত দিন উপবাস করিত, তবুও সে জয়হরি-প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী খাইত না বা গৌরীশকে খাইতে দিত না। এক দিন মাতার অমতে গৌরীশ জয়হরি-প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মাতার নিকট এরূপ প্রহারিত হয় যে, অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহার পর সে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বরং আম্র বা পেয়ারার পত্র চর্ব্বণ করিত, তবুও খুল্লতাত-প্রদত্ত কোন খাদ্য দিলে স্পর্শও করিত না।

২

গৌরীশের মাতা বড়ই কলহপ্রিয়া ও দাম্ভিকা, এই হেতু কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না। কিন্তু নিরাশ্রয় বিধবা ও বালকের গ্রাসাচ্ছাদন কষ্ট দূর করণাভিপ্রায়ে জয়হরির আশ্রয়দাতা মহাত্মা বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়ের স্ত্রী গৌরীর মাকে আপনার বাটীতে পাচিকা রাখিবার

প্রস্তাব করেন। গৌরীর মা ইহাতে অগ্নি অবতার হইয়া বৈদ্যনাথ বাবুর বাটীতে আসিয়া "আমি কি বুনিয়াদী ঘরের মেয়ে নই? আমার স্বামী কি হাভেতে লক্ষ্মীছাড়া ছিল, তাই আমি রাঁধুনী থাকিব" এই বলিয়া তুমুল ক্রন্দন আরম্ভ করিল। বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী স্বভাবসুলভ মিষ্ট ও নম্র বাক্যে কহিলেন,—"দিদি! তুমি রাগ করিও না। তোমাকে রাঁধুনী থাকিতে কে বলিতে পারে? তবে কি জান—আমার শরীর বড় অসুস্থ, তাহাতে অরুচি। তোমার রন্ধন বড়ই চমৎকার, একবার মুখে দিলে আর ভুলিতে পারা যায় না, তাই বলিতেছিলাম যদি দয়া করে দুই এক দিন রসুই করিয়া দেও, তবে বড় উপকার হয়।"

গৌরীর মা ভাল পাক করে বা সে বেশ শিল্প কার্য্য জানে, এ কথা বলিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে বলিল, তাই বল না কেন, আমার রান্নার যে না সুখ্যাতি করে, সে মানুষই নয়। আচ্ছা, কাল থেকে যতদিন না তোমার অসুখ সারিবে, আমি পাক করিয়া দিব।

একদিন দুদিন এক মাস দু মাস করিয়া এক বৎসর গৌরীর মা বৈদ্যনাথ বাবুর বাটীতে রন্ধন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী অতি সহিষ্ণু ও মিষ্টভাষিণী, তাই তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন। গৌরীর মাও বিলক্ষণ সুবিধা বুঝিয়া—পরোপকার-ব্যপদেশে সপুত্রে নির্ব্বিঘ্নে বৈদ্যনাথ বাবুর অন্নে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু গৌরীর মা এ সুবিধা বেশী দিন ভোগ করিতে পারিল না। অসময়ে বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী গতাসু হইলেন। গৌরীর মায়ও অন্ন উঠিল। বাবুর বাটীর আর কাহারও সহিত তাহার বনিবনাও হইল না। কেবল দুবেলা ঝগড়া বচসা গালা-গালি হয় দেখিয়া বৈদ্যনাথ বাবু গৌরীর মাকে বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে সংস্কার না হওয়াতে গৌরীর মার গৃহখানির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। চালে খড় না থাকায় বৃষ্টির জলে দেওয়ালের অধিকাংশ স্থান ধসিয়া গিয়া ঘরখানি পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ইহার উপর আবার মুষিকে মৃত্তিকা তুলিয়া গৃহখানিকে একেবারে অব্যবহার্য্য করিয়াছে। গৌরীর মা গৃহের দুরবস্থা দেখিয়া প্রথমে দেবরকে গালি দিতে লাগিল, পরে স্বীয় পিতৃবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

জয়হরি রোরুদ্যমানা ভ্রাতৃজায়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক তাহাকে নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন। এই সময় হইতে দেবরের সহিত গৌরীর মার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। জয়হরি ও তাঁহার পত্নী প্রাণপণে গৌরীর মার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

জয়হরি গৌরীশকে আপন পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। আপনি কষ্ট সহ্য করিয়াও ভাল খাদ্য সামগ্রী গৌরীশকে খাইতে দিতেন, আপনি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়াও গৌরীশকে ভাল কাপড় পরাইতেন, আপনি ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিতেন, কিন্তু গৌরীশের জন্য সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুতঃ যাহাতে গৌরীশের কোনও বিষয়ে কিছু-মাত্র কষ্ট না হয়, তজ্জন্য জয়হরি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। গৌরীশের বয়স ৮।৯ বৎসর হইল দেখিয়া জয়হরি তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে প্রেরণ করিলেন। গৌরীশ বেশ বুদ্ধিমান্, কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিল।

৩

মাধব নগরের জমিদার গোবিন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষীসদয় বাবুর মাধব নগরস্থ নায়েব হরমোহন বাবু জয়হরি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরীশকে আপনার অধীনে একজন সামান্য মোহরার নিযুক্ত করিলেন। গৌরীশ নানাপ্রকারে তোষা-মোদপ্রিয় নায়েবের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। একদিন উক্ত নায়েব গৌরীশকে কহিলেন, "তুমি জামিন দিতে পারিলে আমি তোমাকে তহশীলদারী কার্য্য দিতাম।"

গৌরীশ এই কথা স্বীয় খুল্লতাতের নিকট ব্যক্ত করিল। গৌরীশ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাবী উন্নতির আশায় পরম পুলকিত হইয়া উক্ত নায়েব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমার স্বোপার্জ্জিত যে সামান্য বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা জামিন দিলে যদি গৌরীশের চাকরী হয়, তবে আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। হরমোহন বাবু জয়হরির বিষয় সম্পত্তি জামিন রাখিয়া গৌরীশকে তহ-শীলদারী কর্ম্ম দিলেন।

গৌরীশ বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। আপনি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মাতাপুত্রে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। জয়হরি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া এক সুন্দরী পাত্রীর সহিত গৌরীশের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। যথাকালে বিবাহ হইল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে জয়হরির সহিত গৌরীশ ও তাহার মাতার বাক্যালাপ বন্ধ হইল।

জয়হরি যে গরীব তাহাই রহিলেন, কিন্তু গৌরীশ দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। হরমোহন বাবু বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হওয়াতে কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। গৌরীশ সুযোগ বুঝিয়া লক্ষী-সদয় বাবুর সদর কাছারির প্রধান কর্ম্ম-চারীকে যথেষ্ট উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক মাধব নগরের নায়েবী পদ গ্রহণ করিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে জমিদারের নায়েব মফঃস্বলের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল। এক্ষণকার মত পুলিশের সুবন্দোবস্ত না থাকায় জমিদারের কর্ম্ম-চারিগণ নিরীহ প্রজাগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিত।

৪

নায়েবীপদ প্রাপ্ত হইয়া গৌরীশ চন্দ্রের অর্থলালসা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান তাহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। প্রজাদিগের দেয় খাজনা একবারের পরিবর্ত্তে পাঁচবার আদায় করিয়া লইয়াও আবার তাহার জমি জমা বাস্তবাটী প্রভৃতি বাকী খাজনার দায়ে বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিল। প্রজাগণ তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু গৌরীশ একে দুষ্টবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তাহাতে আবার অর্থবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে দণ্ডিত করিতে গিয়া অনেক সরলবুদ্ধি নিরীহ প্রজা আপনারাই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া আসিল। কোন কোন প্রজা তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মাধব নগর পরিত্যাগ করিল, কেহ জমি জমা বিক্রয় করিয়া তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক হইল, কেহ বা অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরকে জানাইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

গৌরীশ চন্দ্রের মাটির ঘরের পরিবর্ত্তে সুন্দর ইষ্টকালয় হইয়াছে, প্রচুর অর্থ সামর্থ্য হইয়াছে, লোকসমাজে বিলক্ষণ সম্ভ্রমও হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও তাহার মনে শান্তি নাই। অশান্তির একমাত্র কারণ,—জয়হরি আজিও গতাসু হয় নাই। জয়হরির অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহার মাটীর ঘর, তিনি যার তার সহিত মিশিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা কন ; এই সকল কারণে গৌরীশ তাঁহাকে খুড়া বলিয়া ডাকা দূরে থাকুক, আদৌ তাঁহার সহিত কথা কহিত না। জয়হরি তাহার খুড়া, এ কথা কেহ বলিলে গৌরীশ তাহার উপর অন্তরের সহিত বিরক্ত হইত। জয়হরি মৃত বা দেশান্তরিত না হইলে স্বীয় ভূতপূর্ব্ব দুঃখ দারিদ্র্যের কথা লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইবে না, স্থির করিয়া গৌরীশ তাহাকে মাধব নগর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য স্থিরসংকল্প হইল। গৌরীশের আজ্ঞামতে কয়েকজন দুষ্ট লোক আসিয়া জয়হরির গৃহের একখানি চাল কাটিয়া দিল। জয়হরি প্রথমে নিবারণ করিল, পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিল ; কিন্তু কিছুতেই তাহারা চাল কাটিতে নিরস্ত হইল না। তাহারা বলিল,—বাবুর (গৌরীশের) পথ চলিবার অসুবিধা হয়, তাই চাল কাটিয়া দিলাম।

গৌরীশের এই অন্যায় আচরণের কথা তাহার মাতাকে জ্ঞাত করিবার জন্য জয়হরি গৌরীশের অট্টালিকায় পদার্পণ করিল। গৌরীশ-পত্নী বৃদ্ধকে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, —"বুড় শাপের মেজেতে উঠলি কেন, খুর পিছলে যে পড়ে যাবি।" জয়হরি বধূর এই বিদ্রূপবাক্যে যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ব্যথিতস্বরে কহিলেন, "বাছা, তোমার কথা ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত নয়। আমি না তোমার শ্বশুর !"

গৌরীশের মাতা নিকটেই ছিল। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সে রোষ-কষায়িত স্বরে কহিতে লাগিল, "কি! আমার বৌ ভদ্রলোকের মেয়ে নয়। তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, যা মুখে আসে তাই বলিস্। লক্ষ্মীছাড়া হাভেতে, আমার বাড়ী থেকে দূর হ, তোরে দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়।"

জয়হরি বড় আশা করিয়াছিলেন গৌরীশের মাতার কাছে কিছু না কিছু সান্ত্বনা পাইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকতর বিমর্ষ ও ব্যথিত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

৫

গৌরীশ প্রতিদিনের ন্যায় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কাছারি হইতে বাটী আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতেছে। গৌরীশকে দেখিয়া তাহার মাতা সক্রোধে কহিতে লাগিল,—"আমরা আর এ বাটীতে থাকিতে পারিব না। তুমি যা হয় বন্দোবস্ত কর।" গৌরীশ ব্যগ্রভাবে কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে গৌরীশ-জননী সজল-নয়নে কহিল, "হা! অদৃষ্ট আমার! আমার বৌমাকে যে সে যা তা বলিবে! এর চেয়ে আমার মরণ ভাল। ঐ জয়হরে বুড় আজ আমার বাড়ী এসে বৌমাকে কি না বলে গেল! অজেতের মেয়ে, অসৎ বংশ, লক্ষ্মীছাড়া, আর কত কি বল্‌লে—সব মনে হয় না। এমন কি মারিতেও উদ্যত। এর কোন ব্যবস্থা কর ত ভালই, নচেৎ আমরা শাশুড়ী বৌ গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

গৌরীশের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। বাবু রাগান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে কাছারিতে গেল। গৌরীশের মূর্ত্তি দেখিয়া কাছারির সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল, না জানি আজি কার সর্ব্বনাশ হয়! বাবু মছলন্দে উপবিষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়াবস্থার একমাত্র রক্ষক জয়হরিকে কান ধরিয়া কাছারিতে আনিবার আজ্ঞা প্রদান করিল। দুইজন দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ধরিয়া বাবুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। জয়হরিকে দেখিবামাত্র গৌরীশ হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া পঞ্চাশৎ পাদুকা প্রহারের আজ্ঞা দিল।

জয়হরি, যে গৌরীশ চন্দ্রকে অন্তরের সহিত স্নেহ করেন, যাহার মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করেন, যাহার সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন, সস্ত্রীক উদর জ্বালা সহ্য করিয়াও কষ্টোপার্জ্জিত অন্ন পানীয়ে যাহার জীবন রক্ষা ও দেহ-পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, পৌষের দুরন্ত শীত ও ভাদ্রের প্রবল ধারা অক্লেশে সহ্য করিয়াও যাহাকে সুবেশ ভূষায় সুশোভিত করিতেন, অদ্য সেই গৌরীশ চন্দ্র তাঁহাকে পাদুকা প্রহারের অনুমতি করিল!

জয়হরির এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান হইল না। বর্ষার প্রবল বন্যার ন্যায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সজলনয়নে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বাপ গৌরীশ!" তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—দুঃখে অভিমানে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

আজ্ঞামত কার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গৌরীশ স্বীয় পাদুকা ছুড়িয়া একজন দ্বারবান্‌কে প্রহারপূর্ব্বক সগর্ব্বে কহিল, কি, আমার আজ্ঞা অমান্য!

দ্বারবান্‌দ্বয় ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু বাবুর ভীতিব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া অগত্যা তাহারা স্ব স্ব পায়ের নাগরা খুলিয়া বাবুর হুকুম তামিল করিতে লাগিল।

অহো কি হৃদয়বিদারক বীভৎস দৃশ্য! জয়হরি একে অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহাতে আবার দুঃখ দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নে জীর্ণ শীর্ণ ও হীনবল। সলৌহ নাগরার বিষম আঘাতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, কেবল ভীষণ যন্ত্রণা-সূচক এক প্রকার অস্পষ্টস্বর উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে স্বর মৃদু হইতে মৃদুতর ও মৃদুতম হইয়া অবশেষে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু তথনও বাবুর আজ্ঞামত পূর্ণসংখ্যক আঘাত করা হয় নাই বলিয়া দ্বারবান্‌দ্বয় পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া প্রহার করিতে লাগিল। জয়হরি হত-চেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আজ্ঞা-মত কার্য্য শেষ করিয়া দ্বারবান্‌দ্বয় প্রস্থান করিল। গুণধর গৌরীশ চন্দ্রও সগর্ব্বে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

জয়হরির তনয়গণ এই লোমহর্ষণ সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাছারিতে উপস্থিত হইল। অনেক শুশ্রূষা করিয়া পিতার চৈতন্য সম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে বহন করিয়া লইয়া গেল। জয়হরির বাটীতে কেবল হাহাকার। সকলেই অশ্রুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছে। জয়হরি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা বৃথা রোদন করিতেছ কেন? আমরা দীন হীন নিঃস্ব, আমাদের সহায় নাই, সম্পদ্‌ নাই, আশ্রয় নাই, এ কথা মনে করিও না। সর্ব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর আমা-দিগের পরম বন্ধু। তাঁহাকে দুঃখ জানাও, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ কর, দুঃখ দূর হইবে, হৃদয় শান্ত হইবে, মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে।"

৬

গৌরীশের অত্যাচার উৎপীড়নের কথা জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষীসদয় বাবুর কর্ণে উঠিল। তিনি মাধব নগরের প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ধন, সম্পত্তি, মান, মর্য্যাদা বিচ্যুত অনন্যোপায় প্রজা-

গণের দুঃখ দুর্গতির কথা শ্রবণ ও কাতরতা-ব্যঞ্জক অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি গৌরীশের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া সুন্দররূপ অবগত হইতে পারিলেন যে, সে প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে তদ্ভিন্ন তাঁহার (জমীদারের) নিজের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। লক্ষ্মী-সদয় বাবু রাজবিধির সাহায্যে গৌরীশের স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলেন। গৌরীশ যে পথের ভিখারী, পুনরায় তাহাই হইল ; তবে বিশেষের মধ্যে এই হইল, পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলে কেহ কেহ দয়া প্রকাশ করিত, কিন্তু এক্ষণে সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করে, নরকের কীট—মূর্ত্তিমান্ মহাপাতক বলিয়া তাড়াইয়া দেয়।

মানসিক অশান্তিতে গৌরীশ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী স্বামীর অসময় দেখিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। উন্মাদগ্রস্ত পুত্রকে লইয়া বৃদ্ধা মাতা দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে দেখিয়া জয়হরি যারপর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি গৌরীশ ও তাহার মাতাকে সযত্নে আপনার কুঠিরে লইয়া গেলেন এবং অকপটহৃদয়ে যথাসাধ্য তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

জয়হরি মরজগতে অমরের আদর্শ। তাঁহার ক্ষমা ও পরদুঃখ-কাতরতার তুলনা ইহ জগতে একরূপ অসম্ভব। তিনি যথার্থই ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি।

কদর্থিতস্যাপিচ ধৈর্য্যবৃত্তে
বুদ্ধের্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো
নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥*

সুখ দুঃখের হিসাব।

এ ভবের বাজারে যিনি সুখদুঃখের হিসাবে খতাইতে জানেন, তিনিই প্রকৃত ব্যাপারী। তুমি আমি, রাম, শ্যাম, গোবিন্দ, গোপাল যে চারি দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি, নানা প্রকার বিকি কিনি করিতেছি, আমাদিগকে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারী বলিতে পারি না। আমরাও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত বটে, আমাদিগেরও লাভ লোকসানের খাতা আছে বটে, আমরাও সুখদুঃখ খতাইয়া থাকি বটে, কিন্তু তবু আমরা প্রকৃত ব্যাপারী নহি। যিনি প্রকৃত ব্যাপারী, তাঁহার হাতে

* ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির বুদ্ধিকে হেয়জ্ঞান করিলেও তাহা বিনষ্ট হয় না, অগ্নির শিখাকে অধঃকৃত করিলেও তাহা অধোমুখ হয় না।

পড়িলে, আমাদিগের খাতার লাভ কিছু-মাত্র দাঁড়ায় না—ঋণ ও লোকসানের অঙ্কেই খাতা ভরিয়া যায়। রহস্যের ব্যাপার এই যে, আমরা নিজে খতাইতে গেলে সে লোকসানের অঙ্কটা প্রায়ই দেখিতে পাই না। নিজের ব্যাপরে ত নয়ই—কদাচিৎ পরের ব্যাপারে এ কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া আসিতেছে, অথচ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহাকে কি প্রকৃত ব্যাপারী বলিতে পারা যায়? তাই বলিতেছিলাম, এ ভবের বাজারে আমরা সকলেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত বটে, কিন্তু অনেকেই প্রকৃত ব্যাপারী নহি।

সুখদুঃখের হিসাব বড় শক্ত ব্যাপার—অথচ আমরা প্রত্যেকেই তাহা রাতদিন খতাইতেছি। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনবান্, মধ্যবিধ, দরিদ্র, কে না এই হিসাব খতাইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন? সকলেই খতাইতেছি, সকলকেই খতাইতেও হয়, কিন্তু খতাইতে ভাল করিয়া কেহ শিখিতে পারিতেছি না। শিখিবই বা কিরূপে? ইহাত লেখা পড়ার কাজ নহে যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই দশ পনর টাকায় রাশি রাশি গ্রাজুয়েট, পণ্ডিত বা মুন্সী আসিয়া হাজির হইবে। এ শিক্ষার গুরু অতি কম মিলে—এ ব্যাপারে পরিপক্ক অতি কম লোকই দেখিতে পাই। আর যদিই বা গুরু পাইতে পারি, আমরা পাইতে যে চাহি না। সকলেই মনে করি, আমরা এ হিসাবে পাকা হইয়াছি—পরের কাছে এ হিসাব যে প্রাণান্তেও শিখিতে চাহি না, তাই গুরু থাকিতেও গুরুকে বরণ করিবার ইচ্ছার অভাবে এ শিক্ষা আমরা পাইতে পারিতেছি না। এমন একটা প্রধান বিষয়ের শিক্ষায় লোকে এমন উদাসীন—এ একটা বিশেষ রহস্যের ব্যাপার বটে। সম্প্রদায়বিশেষ ইহাকেই "অবিদ্যা"—বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যেমন বাজারের পণ্য দ্রব্যের, তেমনই এই সুখদুঃখের নানা প্রকার শ্রেণী আছে। যেমন আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি সকলই ফল বটে, কিন্তু একজাতীয় ফল নহে, যেমন ন্যাংড়া, ফজলি, বোম্বাই, দেশী সকলেই আম বটে, কিন্তু এক রকমের আম নহে—সেইরূপ এক সুখ-দুঃখ কথার মধ্যে নানা প্রকার জাতি আছে—আবার এক জাতির মধ্যেই নানাপ্রকার 'রকম' আছে। যিনি আম কাঁঠালের বিভিন্নতা জানেন না, যিনি ন্যাংড়া, ফজলীর বিভিন্নতা বুঝেন না, তিনি কি ফলের কারবারে লাভবান্ হইতে পারেন? হয়ত দুই আনার কাঁঠালটিকে তিনি এক টাকা মূল্যের আমের সহিত বিনিময় করিলেন —হয়ত তিনি একটা দেশী টক আম পাইয়া একটা সুমিষ্ট বোম্বাই আম হারাইলেন। এমন করিয়া কি ব্যাপার চলে? আম কাঁঠালের তত্ত্ব আমরা অল্পাধিক সকলেই জানি বলিয়া, এমন ভুল হয় না সত্য, কিন্তু সুখদুঃখের ব্যাপারে এ ঘটনা অনুক্ষণই ঘটিতেছে। এ ব্যাপারে

কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাঁচ কয়জন না পাইতেছে? অমৃত উদ্গিরণ করিয়া কয়জন না হলাহল পান করিতেছেন! তাই বলিতেছিলাম, বড়ই শক্ত ব্যাপার এই সুখদুঃখের হিসাব খতান—বড়ই কঠিন কার্য্য এই লাভ লোকসানের নিকাশ করা।

সুখ-দুঃখের প্রকৃতি অতীব কঠিন। যিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই সংসারে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। যাহাকে আমরা 'পদস্খলন' বলিয়া থাকি, তাহার মূলে এই সুখদুঃখের প্রকৃতি বিষয়ক অনভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সুখ ও দুঃখটাকে চিনিতে না পারাই লোকের প্রকৃত পতনের কারণ।

প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সুখদুঃখের কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুখদুঃখের হিসাবে পরিপক্ব হইবার জন্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করায় হানি নাই। গীতায় প্রামাণিকতা নাই বা মানিলাম, কথাগুলি যদি ভাল হয়, তাহা শুনিতে দোষ কি?

গীতাকার সুখকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) সাত্ত্বিক, (২) রাজস, (৩) তামস। ক্রমান্বয়ে তাহার লক্ষণগুলি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃত সদৃশ, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ, সেই সুখকে 'সাত্ত্বিক' সুখ বলে।"

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন, অগ্রে অমৃতোপম পরে বিষসদৃশ যে সুখ, তাহাকে রাজস সুখ বলে।"

"যাহার অগ্র ও অনুবন্ধ মোহজনক, নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখকে 'তামস' সুখ বলে।"

ইহাতে দেখিতে পাইতেছি গীতাকার দুই প্রকার অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া এই ত্রিবিধ ভাগ করিয়াছেন।

(১) সুখপ্রাপ্তির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ভাব।

(২) সুখের উৎপত্তিস্থল।

প্রথম হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাত্ত্বিক সুখে অগ্রে কষ্ট, পরে সুখ; রাজস সুখে অগ্রে সুখ পরে কষ্ট; তামস সুখের অগ্রে মোহ, পরেও মোহ। দ্বিতীয় হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন, সাত্ত্বিক সুখের উৎপত্তি আত্মবুদ্ধি হইতে, রাজস সুখের উৎপত্তি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে; তামস সুখের উৎপত্তি আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি হইতে।

এই সকল লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে গেলে, একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে হয়। আমরা ইহার উল্লেখমাত্র করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

যিনি ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ, তিনি দুই চারি দিন কারবার করিয়াই সুখদুঃখের এই লক্ষণগুলি চিনিতে পারেন। চিনিয়া তিনি যথাসাধ্য রাজস ও তামস লক্ষণাক্রান্ত সুখগুলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিক লক্ষণাক্রান্ত সুখটাই বেশী আমদানী করিতে চেষ্টা করেন। এই আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে আরও একটা রহস্য আছে। গুদাম প্রায়ই খালি রাখা যায় না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রহস্যের ব্যাপার

এই যে, এইরূপ সাত্বিক সুখের বেশী আমদানী করিতে করিতে, পরিপক্ক ব্যাপারী শেষে দেখিতে পান যে, রাজস ও তামস সুখের আমদানী অপেক্ষা সাত্বিক সুখের আমদানী বেশী লাভজনক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহার সকল দ্রব্যেই লোকসান দিতে হয়। খতাইয়া খতাইয়া যখন তিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তখন তিনি গুদাম একবারে বন্ধ করিয়া দেন—আর কোন প্রকার আমদানি রপ্তানির ধার ধারেন না। ক্রমে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মহাজন হইয়া পড়েন।

তাই বলিতেছিলাম যে, এ সুখ দুঃখের লাভ লোকসানটা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুখটাকেই যদি লাভজনক দ্রব্য ধরা যায়, এবং দুঃখটাকেই যদি লোকসানের মধ্যে ধরা যায়, তথাপি দেখিতে পাই যে, সব দ্রব্যেই কিছু না কিছু লোকসান দিতে হয়। যে সুখের লক্ষণ দেখিলাম, তাহা ত দুঃখ ছাড়া নহে—বিবেচনা করিয়া দেখিলেও ত সুখের ভাগ নহে দুঃখেরই ভাগ—উহাতে সুখের লক্ষণ নাই, দুঃখেরই লক্ষণ। কিন্তু এ ত কথাতেই বুঝিতেছি। আমাদের এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস কই? এ বিশ্বাস যে দিন হইবে, সেই দিন একবারে এ ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়া প্রকৃত ব্যাপারী হইতে পারিব। নতুবা যেমন করিয়া আমরা সুখ দুঃখের হিসাবটা খতাইতেছি, এমন করিয়া খতাইয়া যুগযুগান্ত কারবার করিলেও, আমরা প্রকৃত মহাজন হইতে পারিব না। তাই বলিতেছিলাম, সুখ দুঃখের হিসাবটা একটু ভাল করিয়া খতাইতে শিখিলে হয় না?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

রত্নমালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদিন শুক্লা রজনীর প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নায় বসিয়া সেফালি চিন্তা করিতেছিল। যদিও রজনীর শৈত্য আর শীতল শিশিরবিন্দুনিচয় তাহাকে স্নিগ্ধ করিতেছিল, তথাপিও তাহার নির্ম্মল ললাট-ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। আজ তাহার পাণ্ডুমুখ উজ্জ্বল, মলিন নেত্র-পদ্ম বিস্ফারিত, হৃদয়ের সমুদয় শিথিল ভাব উচ্ছ্বসিত। সে আজ অজস্র অশ্রুজলে হৃদয়ের দুর্ব্বহ দুঃখভার প্রশমিত করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সহসা কে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল "সেফালি"! সেফালি মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

সম্মুখে সেই সন্ন্যাসী—একটা তড়িৎপ্রবাহ তাহার হৃদয় কম্পিত করিয়া তখনই চলিয়া গেল। তাহার সেই বিষন্ন ভাবের মধ্য দিয়া তাহার সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরে গিয়া নিপতিত হইল। সন্ন্যাসী কহিলেন "সেফালি! চল, তেজকুমার তোমার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছেন।" সেফালি যেন নিজের অজ্ঞাতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তেজকুমারের নিকট দাঁড়াইল।

তেজকুমার কহিল "সেফালি! হরিবোলের পুত্র আবার আমাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে, অতএব আবার আমাদিগকে দেশে যাইতে হইতেছে। সেফালির আরক্ত কপোল আরও রক্তাভ হইল। সে কষ্টে উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া অর্দ্ধ-স্ফুরিত-স্বরে কহিল "যাইব, কিন্তু সে পূর্ব্বের ভাব কোথায়?"

সাশ্রুনয়নে তেজকুমার কহিল—আর নাই—এ জীবনে আর সে সময় ফিরিবে না। বৃদ্ধ পিতার সেই শান্ত গভীর মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর প্রাণ ফাটিতেছিল। তেজকুমার ও সেফালি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আপনাদের পূর্ব্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। হরিবোলের মৃত্যু হইয়াছে। জমীদার মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন।

তেজকুমারের পিতা জমীদারের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ যে অগ্রিম অর্থ লইয়াছিলেন, জমীদার মরিবার সময় সে সমুদায় মাপ করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার ভূমি তেজকুমারকে চিরকালের জন্য বাস করিতে দিয়া গিয়াছেন।

হরিবোলও সেইরূপ করিয়াছে। আপনার গচ্ছিত ধনের অর্দ্ধাংশ তেজকুমারের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে। তেজকুমার এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মুকুলকে জিজ্ঞাসা করিল "একি?" অবনতমস্তকে মুকুল কহিল "যাহা দেখিতেছ তাহাই, অধিক আর কি?"

তেজ। তাহাদের হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন কিসে হইল?

মুকুল। আমার অনুরোধে।

তেজ। সে মোকদ্দমার কি হইল?

মুকুল। আমি সে মোকদ্দমা করিতে দিই নাই। আপনারা মাঝে মাঝে যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসীই আমি।

তখন সেফালির কথা তেজকুমারের স্মরণ হইল। সে বুঝিল মুকুল নিরুদ্দেশ হইয়া যথার্থই নিশ্চেষ্ট ছিল না, তাহাদের জন্য অনেক সময় দিয়াছে।

একদিন জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত মধুর কানন-ছায়াতলে মুকুল প্রস্তরাসনে অর্দ্ধ-শয়নাবস্থায়, আর সেফালি এক অদূর শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট।

মুকুল কহিল "সেফালি!" সেফালির অশ্রুহীন চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি মুকুলের অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিমিলিত হইল। মুকুল আবার ডাকিল "সেফালি"। সে সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া সেফালির সমস্ত প্রকৃতি ম্রিয়মাণ

হইয়াছে। মুমূর্ষু পিতার সে দৃঢ়স্বর সেফালির মনে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। সে আর মুকুলকে কিছু বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অঞ্চলে 'চক্ষু আবরণ করিয়া রহিল। সেফালির পিতার শেষ আজ্ঞা মুকুলের মনেও স্পষ্টরূপে জাগরূক ছিল। সে করুণকণ্ঠে কহিল "সেফালি, স্বর্গে উঠিয়া আবার নিপতিত হওয়া বড় কষ্ট-কর। তোমাকে পাইব বলিয়া কত না আশা ছিল, কিন্তু সে প্রাণভরা আশা ভরসা তীব্র নিরাশার গভীর কূপে নিমজ্জিত হইল। কালের কি চঞ্চল ভাব! সেফালি! একবার তুমি কথা বল, আমার ভগ্ন প্রাণে বল সঞ্চারিত হোক, এ যন্ত্রণা অসহ।" মুকুলের সেই করুণ কণ্ঠস্বর, সেই মর্ম্মোত্থিত কাতর বাণী মুহূর্ত্তকালের জন্ম সেফালিকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল, সেফালি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সংযত হইয়া কহিল "কি আর কহিব? তুমি অনেকানেক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, তোমাকে আর কি কহিব? এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমাদের উভয়ের এই সুন্দর ব্যবধান পরলোকের অনন্ত মিলনের কথা কহিয়া দিতেছে।"

মুকুল ক্ষত বিক্ষত শোণিতাক্ত হৃদয়ে কহিল "পরকাল সে দূর ভবিষ্যতের কথা, সে দুরবস্ত দর্শনে মানব চির-অন্ধ।"

সেফালি তখন মধুর বাক্যে মুকুলকে অনেক বুঝাইল। সেফালির তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুলের মনের প্রনষ্ট বল পুনরুজ্জীবিত হইল। মুকুল বুঝিল, এ জগৎ নশ্বর—এ জীবন নশ্বর; সেফালিকে পিতার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, নচেৎ ঘোর অধর্ম্ম হইবে—অধর্ম্মে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, আর ধর্ম্মপথে সুখ সুনিশ্চিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তেজকুমার হরিবোল-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিল, কিন্তু নিজের জন্য নহে, সে সমুদায় ধনই পরের সেবার জন্য ব্যয়িত হইল। তেজকুমার যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল—শ্রদ্ধার সহিত চির-জীবন সুভগাকেই পূজা করিয়া কাটাইল, আর কখনও দার-পরিগ্রহ করিল না। আর মুকুল কি করিল—মুকুল পিতার ধন সম্পত্তি সমুদায় ভগ্নীর নামে লিখিয়া দিয়া নিজে উদাসীনের ন্যায় দেশত্যাগ করিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা চিরকালের মত আমিত্বহীন ভাবে অণু-পরমাণুবৎ অনন্ত জগতের মধ্যে লুকাইয়া থাকিবে।

সেফালিরও তাহাই সঙ্কল্প—সে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল এবং চিরজীবন ভ্রাতার আশ্রয়েই কাটাইয়াছিল। কিন্তু দেশের সমস্ত স্থানে ভগিনী ডোরা হইতে তাহার পদমর্য্যাদা ন্যূন ছিল না। তাহার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রুত হইয়া আর কেহই তাহাকে বিবাহের

জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। আর সুভগার কি হইল?—তেজকুমার ফিরিয়া আসিলে কিছুদিন পরে তাহার মাতা পরলোকগত হইল। তাহার পর হইতে কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু স্বদেশবাসী পরিচিত লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কামাখ্যাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় একটি নির্ঝর-মুখরিত পর্ব্বতগুহায় একটী রমণীর কণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীতটী শুনিয়াছিল—

"সংসার অনলে, তাপিত হইয়ে,
এলাম শান্তি-নিকেতনে,
আমায় দাও শান্তিবারি, সে তাপ নিবারি,
শীতল করি আজ পাপজীবনে।
বিষয় বাসনা আশায়, ভুলায়ে তোমায়,
রাখে সদা নানা প্রলোভনে,
জান্‌লাম অনিত্য সংসার, তুমি সারাৎসার,
দেখা দাও সন্তানের হৃদাসনে।
নিজ-দাসের অভিলাষ, পুরাও স্ব-প্রকাশ,
প্রকাশ হয়ে একবার হৃদি ভবনে।
আমি অনুতাপাঞ্জলি, ধর পিতা বলি,
পুষ্পাঞ্জলি দেই তব চরণে।" *

সকলেই সে রমণীকে দেখিত, কাহারও কাহারও আবার সেই গুহাবাসিনী বিদেশিনীকে 'সুভগা' বলিয়া ভ্রম হইত।

অমুলা।

বশিষ্ঠ শিষ্য সংবাদ।

শিষ্য। দীর্ঘ রোগ কি?
বশিষ্ঠ। ভবব্যাধি।
শি। ইহার ঔষধ কি?
ব। সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্ব বিচার।
শি। সকল ভূষণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ কি?
ব। শীলতা।
শি। তীর্থ কি?
ব। বিশুদ্ধ মন।
শি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি?
ব। সৎসঙ্গ, ইন্দ্রিয়দমন, তত্ত্ববিচার ও সন্তোষ।
শি। সাধু কাহারা?
ব। অখিলভোগবাসনাত্যাগী মোহ-বিকার-হীন শিবতত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।
শি। প্রাণীদিগের জ্বর কি?
ব। চিন্তা।
শি। মূর্খ কে?
ব। নির্ব্বিবেক ব্যক্তি।
শি। আমার কর্ত্তব্য কি?
ব। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরে ভক্তি।
শি। বিদ্যা কি?
ব। যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে।
শি। বোধ কি?
ব। যাহা মুক্তির হেতু।

* ব্রহ্মসঙ্গীত।

শি। লাভ:কি?

ব। আত্ম-স্বার্থত্যাগ।

শি। জগৎকে কে জয় করিয়াছে?

ব। যে আপনার মনকে জয় করিয়াছে।

শি। সর্ব্বদা দুঃখী কে?

ব। বিষয়ানুরাগী।

শি। কে ধন্য?

ব। যিনি সর্ব্বদা পরোপকারে রত।

শি। সংসার মূল কি?

ব। অবিদ্যা।

শি। দিব্য ব্রত কি?

ব। সম্পূর্ণ দৈন্য ব্রত।

শি। প্রাণীদিগের পক্ষে দুস্ত্যাজ্য কি?

ব। দুরাশা।

শি। পৃথিবীতে পশু কাহারা?

ব। যাহারা বিদ্যাহীন।

শি। কাহাদের সহিত সঙ্গ অকর্ত্তব্য?

ব। মূর্খ, পাপিষ্ঠ, খল ও নীচ যাহারা।

শি। মুক্তিপ্রার্থীদিগের ত্বরিত কর্ত্তব্য কি?

ব। সৎসঙ্গ, ঈশ্বরভক্তি এবং সংসারে নির্ম্মমতা। (ক্রমশঃ)

লবঙ্গলতা।

(চরিত্র-সমালোচন)

বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাসখানি পাঠকালে পাঠকের মন এক সদানন্দময়ী গৃহিণীর চিত্রদর্শনে মোহিত হয়। সে চিত্র লবঙ্গলতার। লবঙ্গলতার মাধুরিতে আমরা হঠাৎ যতদূর আকৃষ্ট হই, গভীরতর প্রণয়ের বিচিত্র চিত্র "রজনীতে" ততটা হই না। বিচিত্রসৌন্দর্য্যশালিনী চিরানন্দময়ী লবঙ্গের চরিত্র আলোচনা করিতেও মনে এক প্রকার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

প্রণয়বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রদর্শনার্থই বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকাগুলির সৃষ্টি। প্রণয়ের অবস্থ-ভোগলালসা-বিবর্জ্জিত উৎকৃষ্টতম চিত্রগুলিই বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্য। "চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জনে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে।" ইহাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণয়ের সংজ্ঞা। এই ভালবাসা-তুলিতে তাঁহার লবঙ্গচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

লবঙ্গ বহুমূর্ত্তিময়ী। লবঙ্গ গৃহিণী, জননী, লবঙ্গ সুরসিকা, লবঙ্গ দাতা, লবঙ্গ সুচতুর। আমরা একবার অন্ধ পুষ্পনারীর কথায় লবঙ্গের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

"রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর, ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের

আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি,ষোল আনা গৃহিণী। * * শুনিয়াছি তিনি রূপসী। তা রূপ যাউক—গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্ত-হস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটী এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহ তুল্য সেই বৃদ্ধ স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কিনা সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিল পেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন, মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রাগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত, লবঙ্গলতা তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চসমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া ঘরময় ঝম্ ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গ আর্য্যের ফুল কিনিত। চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত; বলিত 'এমন কদর্য্য মালা আমায় দিস কেন?' কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত; ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত 'ও আমার টাকা নয়।' দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। * * * সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত।"

এই পরিচয়েই লবঙ্গচরিত্র বোঝা যায়। বহুমূর্ত্তিময়ী লবঙ্গের আর এক প্রধান মূর্ত্তি আছে—সেটী তিনি প্রেমিকা! এই সকলের মূলে তাঁহার সেই অকপট ভালবাসা, তাই লবঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রেমিকা!

বাস্তবিক "শৈশবের ভালবাসায় একটা অভিশাপ আছে।" লবঙ্গ শৈশবে অমরনাথকে ভালবাসিতেন, সেই ভালবাসা কিন্তু সফল হইল না; অমরনাথের সহিত বিবাহ না হইয়া বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। শৈবলিনী শৈশব-প্রথা প্রতাপের জন্য কুলত্যাগিনী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর লবঙ্গ অমরনাথের কথা মুখে আনিলেন না—বরং এক সময়ে অমরনাথকে কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন।

ভালবাসা যে কি, লবঙ্গ তাহা বেশ জানিতেন, আর প্রকৃত মহত্ব যে কিসে, লবঙ্গ তাহাও বুঝিতেন। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, নিজ সুখের আশা পর্য্যন্তও পদদলিত করিয়া অপরের সুখবর্দ্ধনের জন্য আত্মত্যাগে যে কি সুখ, লবঙ্গ তাহা জানিতেন। তাই তিনি শৈশবের মোহময় প্রণয় হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া কঠিন পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া শৈশব-সখাকে ভুলিয়া, কর্ত্তব্যস্রোতে ধর্ম্মপথে গা ঢালিতে পারিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর-প্রথা-বিবর্জ্জিত প্রদেশে লবঙ্গের ন্যায় রমণীরত্ন বড়ই আদরের সামগ্রী এবং সর্ব্বতোভাবে আদর্শ-চরিত্র। যে বৃত্তি শৈবলিনীকে পরাস্ত করিয়াছিল, অমানুষিক হৃদয়বলে—ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অতুল ঐশ্বর্য্যে লবঙ্গ সেই বৃত্তিকে পদদলিতা দাসীর ন্যায় করিয়াছিলেন।

লবঙ্গলতা নিষ্কাম প্রণয়ের প্রতিকৃতি, আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! শৈশবের সুখ-পূর্ণ প্রণয় পদদলিত করিয়া, ভোগেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া, পিতামহ তুল্য বৃদ্ধ স্বামী লইয়া সুখী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। সেই প্রতাপ আর এই লবঙ্গ। দুইটাই যেন এক বৃন্তের দুটী ফুল, সাহিত্য কানন আলো করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

ঘাত প্রতিঘাতে লবঙ্গ-হৃদয়ের প্রণয় খুলিবার তত অবসর পায় নাই। কিন্তু সেই আনন্দ-প্রস্রবণ হৃদয়খানির মাঝে একখানি কালো বিষাদ-মেঘের অস্পষ্ট ছায়া বেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই "কালি, তুই ভালবাসার কি জানিস্? তুমি লবঙ্গলতা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী" এই কথাগুলির মধ্যে লবঙ্গের হৃদয়-নিহিত প্রচ্ছন্ন বিষাদ ব্যক্ত হইয়াছে।

লবঙ্গলতা অমরনাথকে ভালবাসিতেন, তবে স্বহস্তে তাঁহাকে এমন শাস্তি দিলেন কেন? আমরা বলি এই শাস্তি-প্রদানেও লবঙ্গের অমরনাথের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা এবং গূঢ় ধর্ম্মানুরাগ পরিব্যক্ত হইতেছে। (১) *। আমার ভালবাসার পাত্র যে সামান্য বিরহযন্ত্রণায় অধীর ও ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া আমাকে পাইবার জন্য পাপ কার্য্য করিতে যাইবেন এবং কলুষিতচরিত্র হইবেন ইহা প্রকৃত প্রেমিকের অসহ্য। বিশেষতঃ নিজের ভালবাসার পাত্রকে অপরের দ্বারা দণ্ডিত করিতে রমণী প্রাণ থাকিতে পারে না। আর এই শাস্তি দ্বারা লবঙ্গ অমরনাথকে স্বীয় প্রকৃতি চিনাইয়া দিলেন, সেই গর্ব্বাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রতিজ্ঞার ন্যায় পরস্পরের মন ফিরাইলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে মনকে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত নিযুক্ত করিলেন। প্রতিভাশালী কবি বড়ই কৌশলে এই শাস্তি ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন।

লবঙ্গ অমরনাথকে কতদূর পর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অমরের নিকট হইতে রজনী কাড়িবার ব্যাপারে

(১) এখানে সেই পতিপ্রাণা হিন্দু-পত্নী "ভ্রমরকে" মনে পড়ে।

প্রকাশিত। চিরদগ্ধ হৃদয় জুড়াইবার আশায় অভাগা অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। "চিরকাল যে অন্ধকারময় গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সে যদি চন্দ্রকিরণ-সমুজ্জ্বল তরু-পল্লব-কুসুম-শোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ" অমরনাথ সেই আনন্দ উপভোগ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু লবঙ্গ তাহাতেও বাদ সাধিলেন। অমরনাথ সুখী হইলে লবঙ্গের কত সুখ! কিন্তু লবঙ্গ সে সুখ অগ্রাহ্য করিলেন। অমরনাথ অপেক্ষা শচীন্দ্র এখন ধর্ম্মতঃ তাঁহার আপনার। শচীন্দ্র তাঁহার স্নেহের সপত্নীপুত্র। শচীন্দ্রের মঙ্গল তাঁহার অধিকতর আকাঙ্ক্ষণীয়। শচীন্দ্রের রক্ষার উপায় বিধান তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তাই তিনি অমরনাথকে চির অসুখী করিয়া, রজনী কাড়িয়া লইয়া শচীন্দ্রের সহিত বিবাহ দিলেন। কর্ত্তব্যের শাণিত ছুরিকায় আত্মসুখের চরম আশা পর্য্যন্তও ছেদন করিলেন।

শৈশবের ভালবাসায় বাধা পাইয়া লবঙ্গের প্রেম একপ্রকার বিশ্বব্যাপিনী হইয়াছিল। ক্ষুদ্র স্রোতোমুখে বাধা পড়িলে স্রোতের জল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রভাবেই লবঙ্গ পাকা গৃহিণী। সংসারের সকলকে স্নেহ করিতে না জানিলে প্রশংসা নাই। লবঙ্গ স্নেহময়ী জননী; শচীন্দ্রের পীড়ার সময় লবঙ্গের মুখে "আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে আমি মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র বাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।"—এ প্রকার কথাও সেই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রণোদিত। বৃদ্ধ স্বামীকে প্রফুল্লিত ও সুখী করিবার জন্য লবঙ্গের যে রসিকতা, তাহারও মূল—এই ভালবাসা। লবঙ্গ যে দয়াময়ী পরোপকারিণী, তাহাও এই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রভাবে। অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় লবঙ্গের হৃদয়ে ভালবাসা স্রোত প্রবাহিত। সেই জন্যই বলিতেছি, প্রণয়বৃত্তিই লবঙ্গচরিত্রের মেরুদণ্ড।

বঙ্কিম বাবুর প্রধান লক্ষ্য স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত চরিত্র চিত্রণ করা। তাই এক এক স্থলে লবঙ্গচরিত্র বুঝিতে আমাদিগকে একটু ভাবিতে হয়। লবঙ্গ যতই হৃদয় কঠিন করুন না কেন, তিনি মানবী। সাধারণ রমণীর অতিরিক্ত অনেক মানসিক বৃত্তির বিকাশ তাঁহাতে আছে বটে, কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক মনোভাবদ্বারা সুন্দররূপে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রকার সামঞ্জস্য অসামান্য শিল্পকারের অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়!

আমরা এখানে লবঙ্গ ও অমরনাথের বিদায়-দৃশ্যটি উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই দৃশ্যে লবঙ্গের হৃদয় যেমন ফুটিয়াছে—সমগ্র লবঙ্গচরিত্র এই দৃশ্যে যেমন পরিষ্কার হইবার অবসর পাইয়াছে, গ্রন্থমধ্যে আর কুত্রাপিও তদ্রূপ নহে।

"লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?'

অমর। যাইব।

লবঙ্গ। কেন?

অমর। যাইব না কেন? আমাকে বারণ করিবারত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

অ। যদি লোকান্তর থাকে, তবে?

ল। আমি স্ত্রীলোক সহজে দুর্ব্বলা! আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অ। সে কথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চির দিনের মত এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না, কখন মুছিলে যাইবেও না।

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল 'তুমি কু-কাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা-বুদ্ধিতেই কু-কাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড বিধাতা তাহার বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার, কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?'

অমর। তুমি না বলিতেই ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি, উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না, আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি যদি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু অণুমাত্র স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী নহি। তোমার এই সমুদ্র তুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্ত এতটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্ত আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" * * লবঙ্গ কাঁদিতে লাগিলেন। অতি কোমল সকরুণ কাতর ভিক্ষার প্রত্যুত্তরে কি কঠোর উক্তি! ধর্ম্মের কঠোরতা, কর্ত্তব্যের কঠোরতা, এমনই নির্ম্মল বটে। যে বাঁধ একবার শিথিল হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা এমনই কঠিন করিয়া কঠোর পাষাণ দিয়া বাঁধিতে হয় বটে।

উদ্ধৃতাংশ স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত চিত্রের উজ্জ্বল দৃশ্যপট। সেই

নির্ব্বাণপ্রায় শৈশবের প্রণয়-পাবক সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া আবার নিবিল। সেই চির-সংবত হৃদয় সহসা প্রবৃত্তির প্রাবল্যে বিচলিত হইয়া আবার কর্ত্তব্য-পাষাণের গুরু চাপে স্থির হইল। হিন্দুনারীর ধর্ম্ম-জ্ঞান—ধর্ম্মভয় অসীম প্রভাবে লবঙ্গের আলোড়িত হৃদয়-সমুদ্র প্রশমিত করিল।

এমন লবঙ্গলতার চিত্র যে দেশের কবি চিত্রিত করিতে পারেন, সেই দেশ ধন্য! এমন চিত্র যে ভাষা সুশোভিত করে, সেই ভাষা ধন্য! আর যে চিত্রকর এমন চিত্র চিত্রিত করেন, তাঁহার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

ম।

গার্হস্থ্যপ্রবন্ধ।

(৩৯৭ সংখ্যা ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রাচীন কালের গৃহপ্রণালী যেরূপ শান্তিপ্রদ ছিল, সেইরূপ প্রীতিকরও ছিল। তৎকালে হিন্দুদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা অতিশয় আদরণীয় ছিল। হিন্দুগণ সকলেই একান্নভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। সন্তানগণ সর্ব্বদা জনক জননীর সহিত মৃদু বাক্যে কথা কহিতেন, তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেন ও আজ্ঞাবহ থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য সমাদৃত হইতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে পুত্রবধূর ন্যায় স্নেহ করিতেন। খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণ পিতামাতার ন্যায় পূজিত হইতেন। দাস দাসীবর্গ ছায়া স্বরূপ এবং পরম বিশ্বাসপাত্র ছিল।

গৃহস্থ যদি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতেন, তবে গলবস্ত্র হইয়া যোড়হস্তে তিনি স্বয়ং আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যেরূপ বিনীতভাবে সাদরে সম্ভাষণ করিতেন, তাহা ভাবিলে, আনন্দে প্রাণ পুলকিত হয়।

প্রত্যেক গৃহেই সাদরে অতিথিসেবা সম্পাদিত হইত। তৎকালে অতিথি-সৎকার একটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরি-গণিত ছিল। পাছে কোনও অতিথি বিমুখ হন, এই ভয়ে গৃহস্থগণ সতত সন্ত্রস্ত থাকিতেন। গৃহে কোনও অতিথি সমা-গত হইলে, গৃহস্থ পরম আপ্যায়িত হইতেন। অভ্যাগত ব্যক্তিকে কোন্ শান্তিপ্রদ স্থানে উপবেশন করিতে দিবেন, কোন্ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা পরিতৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করাইবেন—তজ্জন্য ব্যাকুল হইতেন। নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হইত না। অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাদরে সন্তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং

তাহার বিশ্রামের জন্ম সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহস্থ শেষে স্নানাহার করিতেন। প্রাচীনকালে এদেশীয় ললনাগণও প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় নারীগণ অপেক্ষা উচ্চ স্থলে অবস্থাপিত ছিলেন। তাঁহারা গুরুজনদিগের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণা ছিলেন। আত্মীয়মণ্ডলী ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি এরূপ প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহাদের গুণে সকলে বশীভূত হইত। তাঁহারা গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহারা এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত গৃহ-কার্য্য সমাধা করিতেন যে, কোনও বস্তুর অভাব বোধ হইত না। তাঁহারা সর্ব্বদা গৃহের লক্ষ্মীরূপে বিরাজমান থাকিতেন। তজ্জন্যই বোধ হয় "স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন''—স্ত্রীতে ও শ্রী (লক্ষ্মী)তে কোনও বিশেষ নাই—এই বাক্য প্রসিদ্ধ।

আর্য্যনারীগণ অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অত্যদ্ভুত ও অনন্ত পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় ললনাগণের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন।

বিদ্যা ও তত্ত্বালোচনায় ইহাঁরা প্রাচীনকালে কত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রাচীনতম মহাগ্রন্থসমূহ তাহার পরিচয় দান করিতেছে। অনেকানেক বিদুষী নারী বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে ঋগ্বেদ ও আর্য্যজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন ইহাঁদের নাম বিলুপ্ত হইবার নহে।

তাঁহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রানু-লোচনাতেও ন্যূন ছিলেন না। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্যামহিলা রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের ন্যায় রাজসভায় ও তপোবনে গভীর জ্ঞান ও শাস্ত্রানুলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুধু গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, সতীত্বে সর্ব্বদেশীয় ললনাগণের শীর্ষস্থানীয়া, বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনে পারদর্শিনী ছিলেন এমন নহে; তাঁহারা আশ্চর্য্য স্বদেশানুরাগিণীও ছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতব্রতে স্বকীয় অঙ্গ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ আপনাদের মস্তকের কেশগুচ্ছ অনায়াসে কাটিয়া দিতেন। তাঁহারা একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকেও সমরক্ষেত্রে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। পুত্রকে উদ্দীপনা-বাক্যে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক হস্তে করবাল দিয়া যুদ্ধযাত্রাকালে বলিতেন—"যাও পুত্র যাও, হয় যুদ্ধে জয়লাভপূর্ব্বক এই করবাল হস্তে জয়োৎসাহে জননীর পাদবন্দনা করিও; অথবা রণে হত হইয়া করবালোপরি জননীর নিকট আনীত হইও।" কি আশ্চর্য্য স্বদেশানুরাগ! এই কার্য্যে বীরত্বের পরিচয় যত, স্বদেশ-

প্রেমের পরিচয়ও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃত বীরত্ব—পুরুষোচিত বীরত্ব ভারতরমণী যেরূপ দেখাইয়াছেন, এমন আর পৃথিবীর কোন্ জাতির রমণী দেখাইয়াছেন?

প্রাচীন কালের ভারতরমণীগণের কার্য্যসমূহের বিষয় চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান, খনা ও লীলাবতীর গণিত ও জ্যোতিষ-জ্ঞান, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর পতি-প্রেম ইত্যাদি পূর্ব্বকালের ভারতললনা-গণের কীর্ত্তিকলাপ অবিনশ্বর নক্ষত্ররূপে মানবরাজ্যের হৃদয়াকাশে অনন্তকাল দেদীপ্যমান রহিবে। প্রাচীনকালে এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একরূপ ছিল। তখন পুরুষগণ ভার্য্যা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইলে পূর্ব্বে স্বীয় জননী ও দুহিতাকে স্মরণ করিয়া তাহার দিকে চাহিতেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে ভারতে পারিবারিক ও নৈতিক উৎকর্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করিত। আহা! প্রাচীনকালের গৃহচ্ছবি কেমন পবিত্র ও সুন্দর ছিল। গৃহে গৃহে নিয়ত কীদৃশ সুখ শান্তি বিরাজ করিত। চিন্তা করিলে এক দিকে যেমন প্রাণ আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই আবার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রাণ দুঃখসাগরে ডুবিয়া যায় ও নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

পুরাণ জ্বর প্লীহা ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক পাঁচন।

চিরেতা … …	২০ তোলা।
মঞ্জিষ্ঠা … …	২০ তোলা।
রক্তচন্দন চূর্ণ …	২০ তোলা।
অতইচ … …	১০ তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী—ইহাদের মধ্যে চিরেতা ও মঞ্জিষ্ঠাকে দা দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ২০ তোলা পরিমাণে ওজন লইয়া বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন, তৎপরে ভাল রক্ত-চন্দন কাষ্ঠকে দা দ্বারা চাঁচিয়া চাঁচিয়া, কিম্বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছেদন-পূর্ব্বক রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া হামামদিস্তা দ্বারা চূর্ণি করিয়া ঐরূপ পরিমিত ২০ তোলা লইয়া হাঁড়ির মধ্যে প্রদান করিবে। পরে অতইচ। ইহা হরিদ্রাবৎ মূল বিশেষ, চেষ্টা করিলে বণিকের নিকট প্রাপ্তব্য, দুষ্প্রাপ্য নয়, কিঞ্চিৎ বিষাক্ত; আর অধিক দিনের পুরাতন হইলে পোকা ধরে, ফলে পোকা ধরা অতইচ না হয়, এইরূপ উত্তম ১০ তোলা অতইচ লইবে। ইহাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা করিয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক ১৬ সের জলে

ভিজাইয়া ৬।৭ ঘণ্টা রাখিয়া পরে চুল্লির উপরি হাঁড়ি বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে। এইরূপ পাক হইতে হইতে যখন ৯ সের আন্দাজ জল থাকিবে, সেই সময়ে হাঁড়ি নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ১২টী বোতলে পূরণ করিবে। তৎপরে "ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাসিড" ৩০ বিন্দু (ফোঁটা), আর "ষ্ট্রং মিউরেটিক য়্যাসিড" ৩০ বিন্দু (ফোঁটা)—এই ৬০ বিন্দু য়্যাসিড দ্বারা ৪০ গ্রেণ "সলফেট্ অফ্ কুইনাইনকে" দ্রবীভূত করিয়া উহার মধ্যে একটি বোতলে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বোতলে ষ্ট্রং নাইট্রিক ও মিউরেটিক্ য়্যাসিড্ এবং সলফেট্ অফ্ কুইনাইন যোগ করিয়া বোতলগুলি কর্ক ও গালা মোহর করিলেই পুরাতন জ্বর প্লীহা ও যকৃতাদি জঠররোগনাশক পাঁচন প্রস্তুত হইল। ইহা সেবনের ব্যবস্থা ও ফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক ছটাক পরিমাণে দুইবার ৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্ক বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুইবার; ৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্ক-শিশুর পক্ষে দেড় কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুইবার; তদপেক্ষা অল্পবয়স্কের পক্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা; সকলকেই জ্বরবিরাম-কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ দ্বারা জ্বরাদির নিবৃত্তি হইলেও কিছু দিন ইহা অর্দ্ধমাত্রায় সেবন করা বিধেয়। সেবনকালে বোতল নাড়িয়া কাঁচের বা প্রস্তরের কিম্বা মৃন্ময় পাত্রে ঢালিয়া পান করিবে।

ইহার আরোগ্যফল কলিকাতায় প্রচলিত ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধ কয়েকটী অপেক্ষাও অধিক। এই অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা দুর্জ্জয় প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, পাণ্ডু, কামল, হলীমক, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সংযুক্ত জ্বর, কুইনাইনের পুনর্জ্বর, একদিন বা দুইদিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষমজ্বর, এবং প্রমেহ পর্য্যন্ত অতি সত্বর, এমন কি তিন চারি দিনের মধ্যেই নিবৃত্ত হইবে। পরে দিন দিন যত সেবন করা হইবে, ততই ইহা পূর্ব্বোক্ত দুর্জ্জয় প্লীহাদি জঠররোগের বিশেষরূপে সঙ্কোচ বিধানপূর্ব্বক অগ্নি ও বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন করিবে। রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে প্রতি বোতলে সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ৫ আউন্স পরিমাণে যোগ করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধ বোতলমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক কর্ক আঁটিয়া ও গালা মোহর করিয়া রাখিবে।

দ্রব্য পরিপাক।

যে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হইতে যে সময় লাগে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রব্য	সময়
এরারুট	২॥০ দণ্ড

দ্রব্য	সময়	দ্রব্য	সময়
খইয়ের মণ্ড	২॥০ দণ্ড	পটোল, ঝিঙ্গা, কাঁচকলা, থোড় ও কুষ্মাণ্ডাদি	৭ দণ্ড
সাগুদানা	২॥০ ,,	তরমুজ ও ফুটি	৬ ,,
পুরাতন তণ্ডুলের মণ্ড	৩ ,,	আতা ও নোনা	৪ ,,
যবের মণ্ড	৪ ,,	লিচু ও গোলাপজামাদি	৭॥০ ,,
পাণিফলের পালো	৩ ,,	পক্ক আম্র	৬ ,,
ধানের খই	৩ ,,	কাঁচা আম্র ও শসা	৭॥০ ,,
মুড়ি	৬ ,,	ডাব নারিকেলের শস্য	৫ ,,
মুড়কি	৫ ,,	কিসমিস্	৫ ,,
ভাজামুগের ডাইল	৬ ,,	বিল্ব বা শ্রীফল	৫ ,,
মসুর ডাইল	৫ ,,	দাড়িম্ব	২॥০ ,,
ছোলা মটর ও অড়হর ডাইল	৭॥০ ,,	আঙ্গুর	৪ ,,
মাসকলাইয়ের ডাইল	৫ ,,	বাদাম ও পেস্তা	৯ ,,
পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন	৫ ,,	ছাগদুগ্ধ	৫॥০ ,,
নূতন তণ্ডুলের অন্ন	৮ ,,	গব্যদুগ্ধ	৫ ,,
রুটী	৭॥০ ,,	ঐ ছানা	৮ ,,
লুচী, কচুরি, মিঠাই, জিলাপী ও মোহনভোগ	৯ ,,	ক্ষুদ্র মৎস্য	৫ ,,
গুড় ও সন্দেশ	৭॥০ ,,	গলদাচিঙ্গড়ি ও অন্যান্য বৃহৎ মৎস্য	৭॥০ ,,
মিছরী, বাতাসা ও চিনি	৫ ,,	শামুক ও গুগ্লী	৮ ,,
বেগুন ও ডুমুর	৫ ,,	সুসিদ্ধ ডিম্ব	৯ ,,
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি	৮ ,,	সুসিদ্ধ ছাগ, হরিণ, মেষ ও কচ্ছপাদির মাংস	৮ ,,
পালং ও নটে শাকাদি	৭॥০ ,,	কপোত, হংস ও কুক্কুট মাংস	৮ ,,
গোল আলু ও রাঙ্গা আলু	৭॥০ ,,	কালিয়া (ঘৃত ও মসলা সংযোগে পাক)	১০ ,,
মূল, শালগাম ও গাজরাদি	৭॥০ ,,	পলান্ন (পোলাও)	১২ ,,
পক্ক কাঁঠাল	৯ ,,		

মৃত্যু।

১

মরণের নামে কেন গো সকলে
সতত এমন শিহরে উঠে ?
কেন হয় মুখ মলিন তাদের
হৃদয়ে দারুণ আতঙ্ক ছুটে ?

২

মৃত্যু কভু নহে শত্রু মানবের,
মৃত্যু যে বিধির অমূল্য দান!
মৃত্যুর জনম—নর নারী সবে
শোক দুঃখ হ'তে করিতে ত্রাণ!

৩

মৃত্যু স্বরগের এক মাত্র দূত,—
বিধির আদেশে নিযুক্ত হেথা,
হাত ধরে সে যে নিয়ে যায় সবে
চির সুখ শান্তি বিরাজে যেথা!

৪

যার কেহ নাই হেথা আপনার,
সহায় সম্বল নাহিক ভবে,
যাহার হৃদয় জ্বলে যাতনায়,
যা'রে ঘৃণা করে জগতে সবে ;—

৫

তারেও যে মৃত্যু করে না অবজ্ঞা,
যায় না কেলিয়া দু পায় ঠেলে ;
সন্তাষি যতনে ভালবেসে তায়
কোলে লয় যেন কোলের ছেলে।

৬

মুছায়ে তাহার নয়নের জল
শোক দুঃখ ভার করিয়া দূর,—
সাদরে সান্ত্বনা দিয়ে যায় লয়ে
চির সুখময় স্বরগপুর!

শ্রীয, না, ম।

বৎসর শেষে চিন্তা।

অ নন্ত কাল সাগরে ডুবিল বৎসর,
আ ত্ম চিন্তা করিবার এই অবসর।
ই হ লোক ছায়া—পরলোক নিত্যধাম,
ঈ শ্বর সহায়, সদা জপ তাঁর নাম।
উ ন্নতি কল্যাণ শান্তি—প্রসাদ তাঁহার,
ঊ র্দ্ধ দৃষ্টি করি চাহ, মিলিবে অপার।
ঋ ষি মুনি ধ্যানযোগে সদা সচেতন,
৯ প্ত নন এ সংসারে প্রমুক্ত জীবন।
এ পারে মৃত্যুর রাজ্য, ওপারে অমৃত,
ঐ হিক ক্ষণিক সুখে হৈওনা ব্যাপৃত।
ও মন! আপন হিত করহ সন্ধান,
ঔ ষধ এ ভবরোগে নামসুধা পান।

ক বলে কপট ভাব করহ বর্জ্জন,
খ ল সঙ্গে নরকেতে নিশ্চয় পতন।
গ তস্য শোচনা কেন বর্ত্তমান ভুলে ?
ঘ টনার স্রোতে ভেসে যেওনা অকূলে।
ঙ বলে ভাঙিয়া ঘুম দেখ আঁখি তুলে।

চ ঞ্চল সম্পদ সুখ জীবন যৌবন,
ছ লনায় ছাই লয়ে ভুল না কাঞ্চন।
জ প তপ মিছা যদি না জান মরিতে,
ঝ টিতি কর্ত্তব্য কাজ হইবে সাধিতে,
ঞ বলে গোঁসাঞ্ দড় হিসাব বুঝিতে।

ট লিলে পাপের পথে অশেষ দুর্গতি,
ঠ কিবে আপনি হবে পাপের মূরতি।
ড ঙ্কা মেরে সাধুজন ভবপারে যায়,
ঢ ক্কা রবে ধর্ম্ম তার সুচরিত গায়,
ণ বলে মরণে রণে সে কি ভয় পায়?

ত পস্যায় সর্ব্ব সিদ্ধি নাহিক অন্যথা,
থ র হরি কাঁপে যম উগ্রতপা যথা,
দ য়া জীবে, নামে ভক্তি, সাধু সহবাস,—
ধ র্ম্ম-তত্ত্ব সার এই, জানিবে নির্য্যাস।
ন র নারী এই ধর্ম্মে করহ বিশ্বাস।

প র-হিতে আত্মস্বার্থ কর বলিদান,
ফ লাফল চিন্তা মনে দিওনাকো স্থান।
ব ল বুদ্ধি সুখ শান্তি উন্নতি কল্যাণ,
ভ গবান্ ভকতের করেন বিধান।
ম ঙ্গলময়ের কার্য্য মঙ্গলনিদান।

য তো ধর্ম্মস্ততো জয় নাহিক সংশয়,
র তন যতনে মিলে জানিও নিশ্চয়।
ল ক্ষ্য রাখি বিভুপদে হও আগুয়ান,
ব দন ভরিয়া কর তাঁর গুণগান।

শ ব করি ত্রিসংসার বসো যোগাসনে,
ষ ড় রিপু জয় করি লভ নিত্য ধনে।
স দানন্দ নাম গাও সদানন্দ মনে।
হ রি বল দিন গেল হও সচেতন,
ক্ষ ণেক বিলম্বে আয়ু গ্রাসিবে শমন।

সাধ্বী কৈলাসকামিনী।

চৈত্রের বামাবোধিনী এবার চৈত্রের মধ্যে প্রচার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিলম্ব হইয়া পড়িল। তাহার একটী প্রধান কারণ উপরি-উক্ত মহিলার দেহত্যাগ ঘটনা। ইনি বামাবোধিনীর সম্পাদক-পত্নী। এত দিন পাঠিকাদিগের নিকট অপরিচিতা থাকিয়াও তাঁহাদের সেবায় অর্থ-সামর্থ্য অনেক ব্যয় করিয়াছেন। বামাবোধিনী-সম্পাদকের গুরুতর পীড়া এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ ১২৮৫ সালে পত্রিকা যখন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইনি নিজের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বামাবোধিনীর পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেন। তদবধি ২০ বৎসর কাল ইনি বামাবোধিনীর কার্য্যভার বহন ও প্রকৃত অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন পাঠিকারা অবগত আছেন, অনেক কাল বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু আশুতোষ ঘোষের নামেই পত্রিকার কার্য্য চলিত, এ সময় এই মহিলাই তাঁহার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে স্বয়ং কার্য্য সকল চালাইতেন। কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইলেও আমৃত্যু তিনি পত্রিকার কার্য্য সকলের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন।

আজি বামাবোধিনী গভীর শোকপূর্ণ হৃদয়ে পাঠকপাঠিকাগণের নিকট শ্রীমতী কৈলাসকামিনীর পরলোকগমনের সংবাদমাত্র দিতেছেন, ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। ইনি সসত্ত্বাবস্থায় হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকষ্ট কিছু দিন মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেন। গর্ভাবস্থায় ঔষধসেবনে ইতিপূর্ব্বে একটী সন্তান নষ্ট হয়, এজন্য ঔষধাদি সেবনে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সকল ক্লেশ দূর হইবে আশা করিতেছিলেন। গত ১৫ই চৈত্র হইতে রাত্রিকালে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইত, অধিকক্ষণ শয়নাবস্থায় থাকিতে পারিতেন না, ভাল নিদ্রা হইত না—ঈশ্বরের নাম বা পরমার্থ সঙ্গীত করিয়া ;অনেক রাত্রি কাটাইতেন। প্রভাতে গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্য করিয়া স্নানানন্তর স্বহস্তে যথাবিধি রন্ধনপূর্ব্বক পরিজনদিগকে খাওয়াইতেন এবং সমস্ত দিবস আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পরিশ্রমসহ সম্পন্ন করিতেন। রাত্রিতে অসুখ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রজনী যাপন করিতেন। ইঁহার আত্মীয়গণ ইহাতে ইঁহার পীড়ার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। গত ২৯শে চৈত্র রজনীতে শ্বাসকষ্টের অত্যন্ত আধিক্য হইয়া হঠাৎ প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার নাম করিতে করিতে ও ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধ সেবনে সে দিন প্রাণ রক্ষা হয়। ডাক্তারেরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, যন্ত্রসাহায্যে শীঘ্র প্রসব না করাইলে মহা বিপদের সম্ভাবনা। রোগী তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন চৈত্র মাসের আর একদিন আছে যাউক, বৈশাখ পড়িলে যাহা হয় হইবে। ঈশ্বরেচ্ছায় ৩০এ চৈত্র সমস্ত দিন এবং কতক রাত্রি সচ্ছন্দে যায়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইতে হইতে আবার দারুণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধ সেবনে পূর্ব্বদিনের মত উপকার বোধ হইল না। রোগী রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রভাত হইলেই স্বামীকে বলিলেন ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া প্রসব করাও। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার জে, এন মিত্র এবং ধাত্রী থাকমণি ঘোষ ও অন্য এক প্রাচীনা ধাত্রী ১লা বৈশাখ বেলা প্রায় ৭॥ টার সময় উপস্থিত হইলেন এবং ৯টার সময় সুপ্রসব করাইলেন। ডাক্তারেরা যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও কৌশলপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া শেষ করা যায় না। প্রসবে কোনও কষ্ট হইল না এবং রোগী একটু সুস্থ হইলেন। আশা করা গেল এইবার একপ্রকার নিরাপদ হইলেন। কিন্তু শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়াতে আবার শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হইল। ডাক্তারেরা ঔষধ ও

শুশ্রূষার যতদূর সাধ্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলেও রোগীর অবসন্নতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অপরাহ্ণ ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও উচ্চারণ করিতে করিতে ইঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল এবং অমর আত্মা অমরধামে প্রস্থান করিল।

ইঁহার স্বামীর নগরস্থ বন্ধুগণের অধিকাংশ ইঁহার পীড়ার সংবাদ কিছু-মাত্র অবগত ছিলেন না, হঠাৎ ইঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া দত্ত-প্রবাস ৯নং আণ্টনিবাগান গৃহে সমবেত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ৬০।৭০ জন লোক উপস্থিত। ইতিমধ্যে শবদেহের একটী ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। পরে দেহ সধবোচিত সিন্দুর, অলঙ্কাদিতে বিভূষিত এবং নববস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইলে সময়োচিত ঈশ্বরোপাসনা হইল। রাত্রি ৯টার সময় দেহ শ্মশানঘাটে নীত হইল। অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য বন্ধুগণ আনন্দে শবদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যান, ইহা মহিলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। শ্মশানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করেন। সৎকারের পূর্ব্বে ও পরে সময়োচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। রাত্রি ৩টার সময় দেহ ভস্মাবশেষ হয়। তাঁহার চিতাভস্ম এবং মস্তকের কেশ যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

কৈলাসকামিনী স্বামী, ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা এবং দুইটী সহোদর রাখিয়া ৪০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার জন্য তাঁহারা এবং প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শোকার্ত্ত। বামাবোধিনীও শোকার্ত্তহৃদয়ে ইঁহার আত্মার চির শান্তি ও সদ্‌গতির প্রার্থনা করিতেছেন, বিশ্ব-জননী তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে ইঁহাকে রাখিয়া কৃতার্থ করুন। বামাবোধিনী ইঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং ইঁহার বিয়োগে ইহার যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবার নহে।

হেঁয়ালী।

ফাল্গুনের হেঁয়ালীর উত্তর।

(১) বেহাতী, (২) আকাশ, (৩) চাল্‌তা, (৪) পাগল, (৫) গোপাল।

চৈত্রের হেঁয়ালী।

মিষ্ট রস মধ্যে সদা করে বিচরণ,
কভু করিল না তার আস্বাদ গ্রহণ। ১

বাদ বিবাদেতে পাবে মম দরশন,
বিবাহক্ষেত্রেতে আমি মধ্যস্থ ব্রাহ্মণ,

বাসর আসরে আগে স্থান মোর হয়;
আমা ছাড়া বাবার অস্তিত্ব নাহি রয়। ২
আদি শেষ দু-অক্ষরে বাজী চমৎকার,
শেষ ছাড়ি আস্বাদনে বড়ই বেতার।
আদি বর্ণ ছাড়িলে মূল্যের নিরূপণ,
তিন বর্ণে কোন্ বস্তু বস্ত্রের বন্ধন ? ৩

অঙ্গে নই, বঙ্গে নই—কলিঙ্গেতে ঘর,
চারি সহোদরমধ্যে কনিষ্ঠ সোদর। ৪
রাজা প্রজা কাঁপে সবে প্রতাপে আমার,
আদি শেষ বর্ণে হই ওজনে ব্যাভার,
শেষ দুই বর্ণে হই ভীষণ ঘটনা,
তিন বর্ণে কিবা নাম আমার বলনা ? ৫

নূতন সংবাদ।

১। আলিগড়ের সার সায়েদ আমাদ খাঁ বাহাদুরের ৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। আলিগড় কলেজ ইহাঁর অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারতের মুসলমান সমাজ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২। মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের পীড়া অচিকিৎস্য বলিয়া ডাক্তারেরা জবাব দিয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

৩। সার আলেক্জাণ্ডার মেকেঞ্জীর স্থলে সার জন উডবরন্ বঙ্গের ছোট লাট হইয়াছেন। ইনি একজন মহাশয় লোক।

৪। ব্রিষ্টল অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রেবরেণ্ড জর্জ মূলার নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। হৃদ্‌রোগই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

৫। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম মেঃ বি এল গুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

৬। মাক্রাজের ধনী নরসিংহ রাও মৃত্যুকালে বিশাখাপত্তনের কলেজের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৭। কানপুরের তামাক-বিক্রেতা হাজি হাসেন কানপুরের অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

৮। ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট সেসন জজ বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র পূর্ণিয়ার সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর দ্রুত পদোন্নতি ইহাঁর বিচারদক্ষতার পরিচায়ক।

৯। বরদার গুইকুমারের পুত্রকন্যাগণ জাপানদর্শনে গিয়াছেন।

বামারচনা।

সকলি স্বপন॥

১

গুরুশ্রেষ্ঠ দেবোপম, সেই যে জনক মম,
ঠাকুর খুড়ার স্নেহ অমূল্য রতন!
আজি মম সকলি স্বপন!

২

সেই যে স্নেহের নদী,রাঙ্গা দিদি, মেজো দিদি
স্নেহের প্রতিমা সেই ভাই দুইজন,*
আজি মম সকলি স্বপন!

৩

শোভিত হৃদয়তল, সেই যে অতি উজ্জ্বল,
পবিত্র স্নেহের ফুল কালীপদ ধন,
আজি মম সকলি স্বপন!

৪

স্বর্নদীর ঢেউ সম, সেই যে পবিত্রতম,
প্রাণের জানকী ভাই হৃদয়রঞ্জন,
আজি মম সকলি স্বপন!

৫

স্বরগের দেবী সম, সেই যে শাশুড়ী মম,
স্নেহস্বরূপিণী বিশ্বজননীর মত,
সব আজ স্বপ্নে পরিণত!

৬

পবিত্র কুসুম থর, পদ্মপূর্ণ সরোবর,
সেই যে ভাগিনী হেম লক্ষ্মীর মতন,
আজি সব হয়েছে স্বপন।

৭

সেই যে দিদি-মা দেবী, শান্তি করুণার ছবি,
দয়াধর্ম্মে ছিল যাঁর মহৎ জীবন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

৮

কত ভাল বাসিয়াছে,তারাও ছাড়িয়া গেছে,
ছোট মামা, ছোট মামী কত দিন যায়,
সব আজ স্বপ্ন সম হায়!

৯

পবিত্র ফুলের মত, সৌরভ ঢালিত কত
হৃদয়ের রক্ত সম শৈলজা রতন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

১০

এই যে ক'দিন হ'ল, বুকে মারি তীক্ষ্ণ শেল
গিয়েছেন ছোট দাদা† ভেঙ্গে দিয়ে মন,
তাও আজ হয়েছে স্বপন।

১১

সে কৃষ্ণ মথুর দাদা‡ কহিত মধুর কথা,
যেমন আছিল দয়া ভক্তিও তেমন,
আজি মম সকলি স্বপন।

অম্বুজা সুন্দরী দাস।

পিসিমার উপহার।

(২৭শে ফাল্গুন—১৩০৪ সাল)

এস এস মা! আমার,
আজ দশ মাস ধরে
রয়েছে আকুল আঁখি
তোমার প্রতীক্ষা করে।
হৃদয় কুসুমময়
আগে হতে তব তরে

---

* ৺বরদা কান্ত সেন, বি, এ, ও ৺ কালী কুমার সেন, এম, এ, বি, এল।
† উমাশঙ্কর সেন, যাঁহার মৃত্যুতে 'বিষাদ ও বেদনা' লিখিত হইয়াছে।
‡ পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্যদ্বয়।

সাজায়েছে, সযতনে,
স্নেহফুল থরে থরে!
হাসায়ে হরষ-ইন্দু
শুভ আগমনী তোর
ঢালিছে জোছনারাশি
আজি এ মরমে মোর!
অন্তঃসীপা স্নেহনীর
উচ্ছ্বসিত, থুকুরাণি!
না হেরেই মা! আমার
তোর ও আননখানি!
এ সুখ জলধি-জলে,
কিন্তু মম হৃদিতরী
কাঁপিতেছে, মাঝে মাঝে,
আতঙ্ক তরঙ্গ স্মরি—
পাছে মা! আঁধারি ধরা
নন্দনেতে যা'স ফিরে,
স্নেহভরা বক্ষঃস্থলি
ভাসায়ে নয়ননীরে!
কোথায় সে যাদুমণি?
আজিরে পড়িছে মনে—
চিরবিসর্জ্জিত সেই
স্নেহের প্রতিমা-ধনে!
জনক জননী অঙ্ক
তুই মা জুড়ায়ে থাক্,
স্নেহের ত্রিদিবে তোর
ভাইটিরে পুনঃ ডাক্;
নিরখি কৃতার্থ হব
কুসুম আনন দুটি,
বিভুর মহিমা গাথা
গাবে এক বৃন্তে ফুটি।
বিধাতার কৃপাকণা
পড়ুক্ তোমার পরে,
হওমা! রমণী-মণি
করুণাময়ের বরে!
ধর মা! কোমল হৃদে
স্বরগ ভূষণরাজি,
বিরাজ এ ধরামাঝে
মনোরম দেবী সাজি!
লভুক তোমার ক্রোড়ে
জীবগণ অসহায়
করুণ-আশ্রয়ভূমি
স্নেহের শীতল ছায়।
নির্ম্মল মানসখানি
হোক্ আরো নিরমল,
উদ্ভাসিত জ্ঞানে ধর্ম্মে,
প্রেমভরে সমুজ্জ্বল!
পিতার পরাণ-প্রিয়
আশার লতিকাচয়,
একক তোহতে বাছা
হোক্ কালে ফুলময়!
জননী-হৃদয়ে নিতি
নব নব প্রীতিজল
সেচি, সে তপত হিয়া
কর তুমি সুশীতল।
সুখে ভোর হোক্ তোর
সারাটি জীবন রাতি,
ছড়াক পুণ্যের শশী
ধরাময় যশোভাতি!
উদ্দেশে সস্নেহাশীষ,
পরম পিতার স্মরে
দিনু তোর ক্ষুদ্র শিরে
সমগ্র হৃদিটি ভরে;

প্রভাত হইলে নিশা
পুলকে ভরিবে বুক,
খুলিবে সুখের উৎস,
হেরি ও নলিন মুখ!
দীনা আমি, কোথা পাব!
রত্নভূষা, অলঙ্কার,
দেখিব মু'খানি তাই
দিয়ে এই উপহার!

ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ—মেদিনীপুর।

বন্ধু

কাঁপিছে নয়ন কাঁপিছে হৃদয়
চরণ কাঁপিছে সঘনে ওই,
হৃদয়ের ভাব লুকাব ভেবেছি
লুকাতে সে ভাব পারিনু কই?
যাঁহার লাগিয়ে হৃদয়-কাননে
পবিত্র কুসুম সোহাগে ফুটে,
জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে ধীরে
মলয় পরশে বিকাশি উঠে।
(যদিও) ছাড়িয়া গিয়াছে, ফিরি ফিরি চায়,
ঘুরি ঘুরি আসে দেখিতে পুনঃ।
(সে) যাইতে পারে কি বেন্ধেছি শিকলে,
ভালবাসা! মরি তোর কি গুণ!

শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১৩০৪ সালের বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নববর্ষ ...	২
আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ...	১১
দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি	৬৫, ৯২
হীরক জুবিলী ...	৮২
রমণীর অপরাজেয়া শক্তির উৎস কোথায়? ...	১৪০
বামাবোধিনীর পঞ্চত্রিংশ জন্মোৎসব	১৬১
বামাবোধিনী পত্রিকার ১৩০৪ সালের সূচীপত্র	৪৭৭

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
হারিয়েট বিচার ষ্টৌ ...	৪
উভয় ভারতী ...	৬৯
মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই	১৮৮
কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের বর্ত্তমান জীবন ...	২১২
দেবী না মানবী? ...	৪১১
দেবী জগন্মোহিনী ...	৪২৫
সাধ্বী কৈলাসকামিনী	৪৭১

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নববর্ষের চিন্তা ...	৩০
ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন	৩২
আমিকে নামি করা ...	৩৪
মতিমালা ...	৪৫
ফিন্‌লণ্ড দেশীয় প্রবচন ...	৫১০
আশীর্ব্বাদাষ্টকং	৫৯
উদাসীনের চিন্তা ...	৬০
বাছুর ধরাণ ...	১০৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রাজভক্তি ও রাজধর্ম্ম ...	১১০
লালা বাবুর দীক্ষা ...	১২৩
পরার্থের সূত্রপাত ...	১৩৬
নরনারীর সাম্য ...	১৬৩
বিপদে শিক্ষা ...	১৭৩
ভবের খেলা ...	১৭৫, ২২৯
বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ভাব ...	১৮১
সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া ...	১৮২, ২২১
দুর্গোৎসবের আমোদ ...	২০৫
দড়ির পাক ...	২১৬
অদৃষ্ট ...	২৩৩
সদুপদেশ ...	২৪৭, ২৯৪
দেবহুতির প্রতি কপিলের উপদেশ ...	২৫৮, ২৮২
গার্হস্থ্য প্রবন্ধ	২৩৮, ২৯২, ৩৮৭, ৪৬৫
প্রকৃত জীবন ...	২৮৬
প্রকৃত স্ত্রী ...	৩২২, ৪০৪
ধর্ম্ম নীচগামী ...	৩২৬
সন্তান পালন ...	৩৩০
শেষ বিচার ...	৩৩৬
আদর্শ হিন্দুপরিবার	৩৪৪, ৩৭৪, ৪১৬
স্বভাবের প্রভাব ...	৩৬২
তাসের ঘর ...	৩৯৫
জীবন বিকাশ ...	৪২০
জীবনের দশ নিয়ম ...	৪৩১
সুখ দুঃখের হিসাব	৪৫৩
বশিষ্ঠ শিষ্য সংবাদ	৪৫৯
৪। ইতিহাস, ভ্রমণ ও দেশাচার।	
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব	১৮, ৫৩
ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ..	২৫
মহরম ...	৯৯
আশ্চর্য্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি	১৩৭
শুক্রবার মন্দ নয় ...	১৩৯
ব্রহ্ম মহিলা ...	২১৩
অরণ্যপথে ব্যাঘ্রদর্শন ...	২৩৪
রাজা ভবচন্দ্র ...	২৩১
মহীসুর রাজ্য ...	২৬৩
বিপৎকালে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ...	২৭০
হিমালয় দর্শন ...	৩০১
সংখ্যা বিষয়ে বিচিত্র সংস্কার	৩১৩
ঐতিহাসিক রহস্য ...	৩৫১
যোদ্ধা পরিবার ...	৩৯৪
দোষের পরীক্ষা	৪৪২
৫ম। উপন্যাস।	
আদর্শ রমণী ...	১৫
কেদার ও অমলা	৫৬, ১৫০, ১৮৫
শৈশব সঙ্গিনী	৯৬, ১২৭, ২২৫, ২৪৪
রাজকন্যা রাহলা ...	২৪৮
ধর্ম্মের জয় ...	২৫১
রত্নমালা	৩০৯, ৩৮৮, ৪০৭, ৪৫৬
বিমাতা ...	৩৭৭
অর্থই অনর্থের মূল	৪৪৬
লবঙ্গলতা	৪৬০
৬। বিজ্ঞান।	
কলালাপ	২১, ৩০৫, ৩৩৯, ৩৬৭
জলজন্তুদিগের যুদ্ধ ...	৫১
জন্তুদিগের বিশেষ লক্ষণ ..	১০৯
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	১৪৭
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী কথা ...	২৫৫

বিষয়। পৃষ্ঠা।

নূতন কলের সৃষ্টি ... ২৭৪
রত্ন ... ৩০১
প্রাচীন ভ্রম ... ৪০২
দ্রব্য পরিপাক ... ৪৬৮

৭। গৃহচিকিৎসা ও গৃহকার্য্য।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ ২৮, ১০৩, ১৫৩, ২৯৭, ৪৬৭
খৈচুর ও চাঁপা প্রস্তুত করিবার নিয়ম ... ১৫৫
পাকা পেয়ারার মোরব্বা ২৩১
গৃহচিকিৎসা ঐ
পাকবিদ্যা ... ২৭৪
গৃহকর্ম্ম—কচি লাউয়ের পায়স ৩১৫
" বোঁদের পায়স ... ৩৯৬
গো-পরিচর্য্যা ... ৩৩৩, ৩৭৩

৮। পদ্য।

বুল বুল ... ৯
আনন্দগীতি ... ৩১
হেঁয়ালি চতুষ্টয় ... ৩৬
হেঁয়ালি ৭৩, ১১০, ১৫৫, ১৯৪, ২৩৫, ২৭৫, ৪৩৪, ৪৭৩
অভিষেচন ... ৪৩
পবিত্রতা ... ৬৪
প্রলয় ... ৮৯
আলেকজাণ্ডার পোপকৃত ইলিয়ডের বাঙ্গালা অনুবাদ ১০৪, ৩৩৪, ৪০৯
ভূমিকম্প ... ১৩২
প্রত্যাখ্যান ... ১৪৬
শোকগাথা (মহারাণী স্বর্ণময়ীর পরলোক গমনে) ... ১৭৯
লক্ষ্যহীন জীবন ... ২২৫
ভুলভাঙ্গা ... ২২৭
খোকার খেলা ... ২৫৫
উচ্ছ্বাস ... ২৭৩
একবর্ষ ... ২৯৫
সঙ্গীত ... ৩০০
স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গামোহন দাস ৩৫০
আত্মঘাতিনী ... ১৩৭
প্রবাসী পুত্রের মাতা ... ৩৮৪
সাধনা ... ৪৪৪
মৃত্যু ... ৪৭০
বৎসরশেষে চিন্তা ... ঐ

৯। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা ... ১
ডাক্তার রামগোপাল ঘোষ ৪৫
বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ ... ২০৩, ২৪২
রাজা ক্রোরী সন্তোষ রায় ২১৭
সেফালি ... ২৮৫
ত্রয়োদশ জাতীয় মহাসমিতি ৩৪৮
ভারতের দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে? ৪১৮
আর্কিমিডিস ও তাঁহার মৃত্যু ৪৩১

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৩, ৪১, ৮১, ১২১, ১৬২, ২০১, ২৪১, ২৮১, ৩২১, ৩৬১, ৪০১, ৪৪১।

১১। নূতন সংবাদ।

৩৬, ৭৩, ১১৩, ১৫৬, ১৯৪, ২৩৬, ২৭৫, ৩১৫, ৩৫৪, ৩৯৭, ৪৫৪, ৪৭৪।

১২। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৩৭, ৭৪, ১৫৬, ১৬২, ১৯৫, ২৩৭, ২৭৭, ৩৯৮, ৪৩৪।

১৩। বামারচনা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সরলার সন্তান ...	৩৮
বিনয় ...	৩৯
শ্রীযুক্তা কনকাঞ্জলী রচয়িত্রীর প্রতি	৪০
নববর্ষ ...	৭৫
সখী বিয়োগান্তে ...	৭৬
বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি	৭৭
জয় ভিক্‌টোরিয়া ...	১১৪
বিধবা কবি ...	ঐ
একাদশী ...	১১৫
শৈলবালা ...	১১৬
কনক ...	১১৭
বাসি ফুল ...	ঐ
বাতায়নে ...	১১৮
কে তুমি? ...	১৫৮
কি চাহিব? ...	১৫০
হল কিবা ভুল ...	ঐ
দুঃখিনী বালিকা ...	১৯৬
হিমাদ্রিশেখর ...	১৯৭
"এই চাই" ...	১৯৮
মমতার ফুল ...	১৯৯
ছিন্ন মালা ...	২০০
ক্ষুদ্র ...	২৩৭
নিরাশায় ...	২৩৮
বনফুল ...	২৩৯
তুমি যদি রাখ পার ...	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিধবার দুঃখ ...	২৪০
স্মৃতি ফিরে চাও ...	২৭৭
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ	২৭৮
কে তুমি রমণী? ...	২৭৯
নিরুপমা ...	২৮০
সারাদিন চেয়ে থাকি ...	৩১৬
সে যে ঠাকু'মার ...	৩১৭
শোকোচ্ছ্বাস ...	৩১৮
হতাশ ...	৩১৯
দিনমণির প্রতি নলিনীর উক্তি	৩২০
প্রাণের দেবতা ...	ঐ
তারা দুটী দেবকন্যা ...	৩৫৫
মহারাণী স্বর্ণময়ী ...	৩৫৬
স্বর্ণ ...	৩৫৮
নিদ্রা ...	৩৫৯
স্বর্ণময়ীর প্রতি ...	৩৬০
আমার খুকু ...	৪৯৮
সরলা সুন্দরী ...	ঐ
বাসি ফুল ...	৩৯৯
শোক অশ্রু ...	ঐ
সেই দেশ ...	৪০০
অনন্ত বিষাদ ...	৪৩৬
বিদায় ...	৪৩৭
সরোজিনীর খুকী ...	৪৩৮
শেষ নিবেদন ...	৪৩৯
সকলই স্বপন	৪৭৪
পিসিমার উপহার	৪৭৫
বন্ধু	৪৭৭